The **parliament** **face**

DECEMBER 2018

www.theparliamentfacebd.com

The parliament face

A journal towards people

Eleven sectors in Bangladesh Shadhinota Juddho (1971)

ভোটের মাঠে জোট

সম্মানে স্মরণে খেতাবপ্রাপ্ত
সম্মুখযুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধাগণ

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন:
কিছু আশা কিছু প্রত্যাশা

জনতা ব্যাংক স্পীডি ফরেন রেমিট্যান্স পেমেন্ট সিস্টেম

প্রবাসে বুকিং দেয়া মাত্রই দেশে তাৎক্ষণিক পরিশোধ...

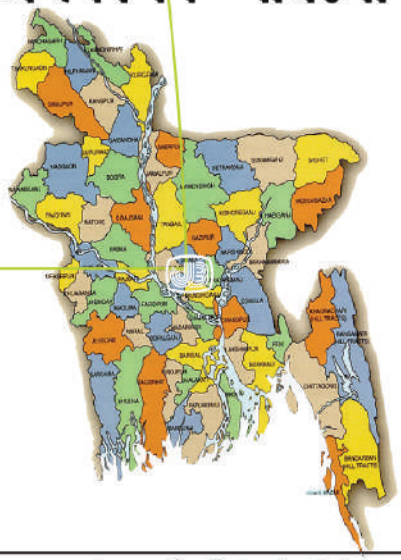

পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে বুকিং দেয়ার সাথে সাথে আপনার আপনজনের কাছে অর্থ পৌঁছানো আমাদের দায়িত্ব।

বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ করে কষ্টার্জিত অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন ও দেশের অগ্রগতিতে শরীক হউন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন , ফরেন রেমিটেন্স ডিপার্টমেন্ট ঃ প্রধান কার্যালয়: ১১০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। ফোন : +৮৮-০২- ৯৬১৫৩০৬, +৮৮-০২-৯৫১৫৩০৪, +৮৮-০২- ৯৫১৫৩০৫, +৮৮-০২-৯৫১৩৯৪৫ ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫৬৪৬৪৪ E-mail: jbceftoperation@janataremitt.com.bd

Website: www.jb.com.bd

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

BURO programs pivot on *Clients' Choice*

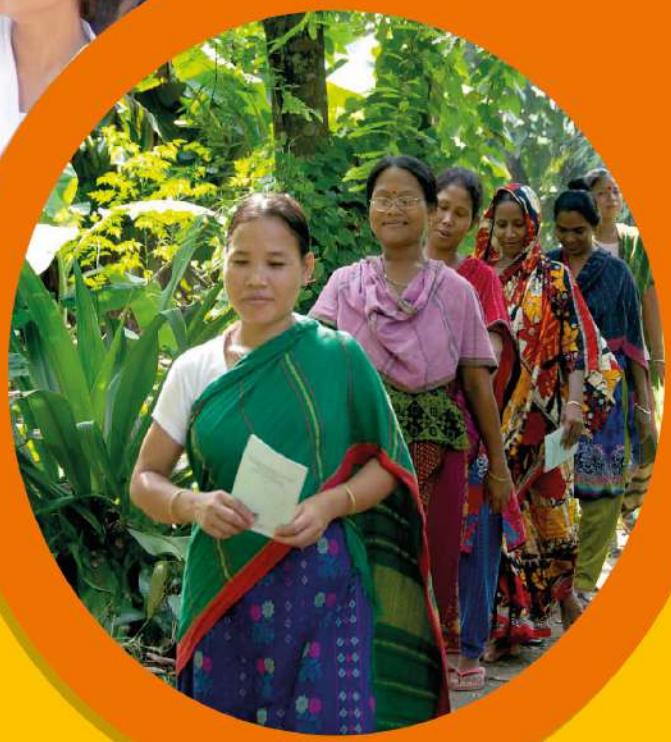

BURO Bangladesh

beside the poor since 1989

HEAD OFFICE

House # 12/A
Road # 104
Block # CEN(F)
Gulshan-2
Dhaka-1212
Bangladesh

TEL
880-2-9861202
880-2-9884834

FAX
880-2-9884832
880-2-9858447

EMAIL
buro@burobd.org
zakir@burobd.org

WEB
www.burobd.org

design : communicator

We Jute

স্বদেশী পণ্যের একটি ই-কমার্স প্লাটফর্ম

404, Golam Rasul Plaza, 1st Floor (A-4), Dilu Road, New Eskaton, Dhaka.
email: info@wejutebd.com, **01926677535**
www.wejutebd.com

The Shade of LIFE

PRAN®

www.pranfoods.net

Delighting consumer taste buds across the globe, PRAN have taken the noble oath to ensure the best in quality brands of food and beverages to millions of people in more than 121 countries of the world. We are proud of our journey, which started in Bangladesh in 1981, to reach you. Our pursuit for happiness will continue till we see that precious smile of fulfillment on YOUR face!

হামদর্দ চিকিৎসা কেন্দ্রে আসুন
হলিস্টিক চিকিৎসা গ্রহণ করুন
সুস্থ, সবল ও দীর্ঘ জীবন লাভ করুন

সারাদেশেই রয়েছে হামদর্দ-এর চিকিৎসা কেন্দ্র
চিকিৎসাসেবা: প্রত্যহ সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত

ব্যবস্থাপত্রের জন্য কোন টাকা নেয়া হয় না

BANGLADESH ISLAMIC FOUNDATION হালাল HALAL

স্বর্গীয় অমৃত সুধা রূহ্ আফজা অনিন্দ্য সুন্দর নাম
Ref. SAVEUR, USA
(Feb 2007)

১৯০৭ সাল থেকে প্রতিটি ঘরে ঘরে জনপ্রিয় নাম

রূহ্ আফজা

স্বর্গীয় অমৃত সুধা, অনিন্দ্য সুন্দর নাম

ইফতার ও সাহ্‌রিতে এক গ্লাস/২০০ মিলি বরফ শীতল পানিতে ৩ টেবিল চামচ/৫০ মিলি রূহ্ আফজা মিশিয়ে পান করুন। শরীর থাকবে চাঙ্গা ও সতেজ, বুঝতেই দেবে না সারাদিনের রোজার ক্লান্তি।

শরবতসহ বিভিন্ন মজাদার রেসিপির জন্য
www.roohafza.com.bd

হামদর্দ ভবন ৯৮-৯৯ বীর উত্তম সি.আর.দত্ত সড়ক, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
www.hamdard.com.bd, www.hamdard.tv
marketing@hamdard.com.bd, info@hamdard.com.bd
Follow us on
Hamdard Roohafza, hamdardbd
Download App Hamdard Bangladesh

হামদর্দ
বিশ্বস্ত নাম, পরীক্ষিত পণ্য

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াকফ) বাংলাদেশ
১৯০৬ সাল হতে মানব সেবায় নিবেদিত অনন্য প্রতিষ্ঠান

সম্পাদকীয়

উপদেষ্টা
মহসীনুজ্জামান চৌধুরী বাবুল
মুক্তিযোদ্ধা নুরুদ্দিন আহমেদ
মাওলানা মো. আশরাফ আলী

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপ্রধান
রীনা জামান

সম্পাদক
মো. মঞ্জুর আলম

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
আলমগীর শাহজাহান রেজা

নির্বাহী সম্পাদক
এ এস এম নজরুল ইসলাম

সম্পাদক মার্কেটিং
মো. মাকসুমুল আরেফিন

সহকারী সম্পাদক
বাবুল রিদয়

সম্পাদনা সহকারী
শাহেদ মোরশেদ

প্রতিবেদক
শেখ লিমন

গ্রাফিক্স ডিজাইনার
প্রিয়াংকা প্রিয়া

নিয়মিত লেখক
মোস্তফা কামাল
বিউটি তালুকদার
দ্বীয়া সিমান্ত
কমল চৌধুরী

মূল্য: ১০০ টাকা

যোগাযোগ:
টেকওয়ার্ল্ড, ২য় তলা
৪০৪, গোলাম রসুল টাওয়ার, দিলু রোড,
ইস্কাটন, ঢাকা

এ এস এম নজরুল ইসলাম
ফোন: ০১৭১১৫৮২৭০২
৩৩/৩ আজিমপুর রোড,
লালবাগ,ঢাকা-১২০৫

এস আর লাকী
ফোন: ০১৯১৮১৬২৫৭৫
১৯, বাসাবাড়ি লেন(৪র্থ তলা)
তাঁতীবাজার, ঢাকা-১১০০

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

সৌজন্য সংখ্যা ঃ ডিসেম্বর ২০১৮

সম্পাদকীয়

দেশ মাটি মানুষ স্ব স্ব ভুখন্ডের অধিবাসীদের অতি প্রিয় অনুভুতি। শ্রদ্ধা সম্মান ভালবাসা আর গর্বের অনুভুতি। বোধটা আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানের। সেই দেশ মাটি মানুষের ভালো থাকা, ভালো লাগা, ভালো বোধনের বীজ রোপনের ক্ষেত্র তৈরীর কাজে নিরলস কর্মব্যস্ত দেশের জাতীয় সংসদ। ১৯৭১ সালের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা আজ আমাদের আত্মমর্যাদার গৌরবগাঁথা। সময়ের ব্যবধানে ঘাত প্রতিঘাতের সংগ্রাম অতিক্রম করে আজ সে ৪৮ বছরের পরিপূর্ন যৌবনদীপ্ত বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বীরত্ব গাঁথা, আত্মত্যাগের মহিমা, আত্মবিসর্জনের শক্তিসোপান, দেশপরিচালনার কান্ডারী, নিরস্ত্র বাঙ্গালীর যুদ্ধ পরিকল্পনা ও কৌশলসহ স্বাধীনতা পরবর্তীতে জাতির পিতা কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সম্মুখ যোদ্ধাদের বীরত্বের সম্মানে বিভিন্ন খেতাবে ভুষিতগণদের অমরগাঁথা নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টায় অবিরাম চলার প্রত্যয় রাখে। দ্য পার্লামেন্ট ফেইস একটি সদ্য ভুমিষ্ট নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশনা বের হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র হত্যাকান্ড স্মরণে জাতীয় শোক দিবসে সংখ্যা হিসাবে। দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রধান প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিত্ব ত্যাগের মহিমাসহ সংসদ সদস্যগণের ছবিসহ সংক্ষেপ বিবরণী। এবারের সংখ্যায় চেষ্টা করা হয়েছে সর্ব ভারতীয় অঞ্চলে তৎকালীন বঙ্গদেশীয় তথা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কৃতিত্বগাঁথা, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, নারী সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন, একাদশ জাতীয় সংসদ ২০১৮ নির্বাচনসহ চলমান তথ্য ও ঘটনা প্রবাহ সম্মানিত পাঠকের দৃষ্টিগোচরের।

স্বাধীন বাংলাদেশ রচিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক কাঠামোতে। জাতির পিতার হত্যার পর বিভিন্ন চরাই উৎরাই পেরিয়ে গণতন্ত্র আজো শক্ত ভিত পাইনি। অবিরাম চেষ্টা চলছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী রুপ দিতে। যদিও পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অতি অল্পসময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশে শক্তিশালী গণতন্ত্র অতীব দূর্লভ। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজন রাষ্ট্রের সহযোগী সকল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল পেশাদারিত্ব। অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতিটি সংস্থাকে প্রত্যেকের কাজ সঠিকভাবে সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদন করা। স্বাধীনতা কাউকে কিছু দিয়ে দেয়ার বিষয় নয়, স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়। আর এই অর্জন স্বাবলীলভাবে সম্ভব শুধুমাত্র সংস্থার বা কাজের পেশাদারিত্বের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পেশাদারিত্ব বজায় চলার চর্চা অব্যাহত রাখলে সমাজে পেশীবল নামক দুষ্টচক্রকারীদের কিছু করার থাকে না। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, গণমাধ্যম বাহিনী ও বিচার বিভাগ এই তিনধরণের সংস্থাগুলো তাদের পেশাদারিত্বটুকু জনগণের আস্থায় রাখতে পারলে সমাজের অস্থিরতা বহুলাংশে নিমজ্জিত হতো। বাংলাদেশ মৌলবাদ প্রশ্রয় দেয় না, জঙ্গিবাদ প্রশ্রয় দেয় না, সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় দেয়না, দূর্নীতি হঠকারিতা প্রশ্রয় দেয়না। শান্তিপ্রিয় দেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের জনগণ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক মানুষের কল্যাণে, মানুষের পছন্দে, মানুষের প্রয়োজনে। গণতান্ত্রিকধারা ও উন্নয়নেরধারা সমেত উন্নত বাংলাদেশের মানুষ কথা বলুক মনখুলে, হাসুক প্রাণভরে, দেশের উন্নয়ণে কাজ করুক হাতে হাত রেখে। প্রত্যাশা রইলো গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম জাতীয় নির্বাচন হোক স্বচ্ছ, সুষ্ঠ, সুন্দর ও রোদরোজ্জল। দ্য পার্লামেন্ট ফেইস সর্বদা সত্য, সুন্দর, সাবলীল সাহসের প্রত্যয় ব্যক্ত করার প্রত্যাশী।

সূ|চি|প|ত্র

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা ৮
কমল চৌধুরী

ভোটের মাঠে জোট ১৬
মোস্তফা কামাল

রাজকাব্য ২২
দীয়া সিমান্ত

জনসেবার রাজনীতি: নূরজাহান বেগম মুক্তা, এমপি ৩০
নাজনীন নাহার

মুক্তিযুদ্ধ স্মরণে বীরবিক্রম শাহজাহান সিদ্দিকী ৩৪
দীয়া সিমান্ত ও নাজনীন নাহার

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৪০
মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

তৃণমূল ভাবনা ৪৫
নিজস্ব প্রতিনিধি

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: ইয়ং ভয়েস ৪৯
নিজস্ব প্রতিনিধি

Rights & Responsibilities of Women Representatives in the Parliament of Bangladesh ৫৩
Beauty Talukder

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ ৫৮
স্মৃতি চক্রবর্তী

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সেক্টর কমান্ডার্স ৬০
নিউজ ডেস্ক

সম্মানে স্মরণে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাগণ ৬৩
নিউজ ডেস্ক

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

সৌজন্য সংখ্যা ঃ ডিসেম্বর ২০১৮

বিশ্ব ইতিহাসে খচিত রাজতিলক "হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী শেখ মজিবুর রহমান" শুধু বাংলাদেশ সাম্রাজ্যের অহংকার বা শুধু আমাদের অহংকার নয়, সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জাতির অনুপ্রেরণা। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রপাধ্যায় সখেদে বলেছিলেন-বাঙালীর কোন ইতিহাস নেই।

দেখুন পৃষ্ঠা ০৮

চিত্র

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব আবুল কাশেম ফজলুল হক ছিলেন বিংশ শতাব্দির একজন বাঙালী মুসলিম আইনজীবি, আইন প্রণেতা ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ। পরবর্তীতে পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার অবদান অবিস্মরনীয়। কোলকাতা হাইকোর্ট এবং ঢাকা হাইকোর্টের স্বনামধন্য এই আইনজীবি বাংলাদেশের বাকেরগঞ্জ (বর্তমানে বরিশাল) জেলার সন্তান ফজলুল হক কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

দেখুন পৃষ্ঠা ২২

ভোট-জোট। লক্ষ্য আর উপলক্ষ্যের বিষয়। গত কয়েক দশক ধরে নির্বাচনকে লক্ষ্য করে ভোটের অংক মেলাতে জোটকে উপলক্ষ্য করা রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জোট সংস্কৃতি আবারও তুঙ্গে। বিগত কয়েকটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতের বাইরে হাতে গোণা কয়েকটি দল থাকলেও এবারের চিত্র ভিন্ন।

দেখুন পৃষ্ঠা ১৬

বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারন করতে পারে। তবে তাদেরকে পরিচালনা করতে হয়। পরিচালনার জন্য একজন যোগ্য নেতা দরকার হয়। যার নেতৃত্বে তারা কাজ করে। প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝাপিয়ে পরে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে ঝাপ দিয়েছিলো সারা বাংলাদেশের মানুষ।

দেখুন পৃষ্ঠা ৪০

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা

কমল চৌধুরী

বিশ্ব ইতিহাসে খচিত রাজতিলক "হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী শেখ মজিবুর রহমান" শুধু বাংলাদেশ সাম্রাজ্যের অহংকার বা শুধু আমাদের অহংকার নয়, সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জাতির অনুপ্রেরণা। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রপাধ্যায় সখেদে বলেছিলেন- বাঙালীর কোন ইতিহাস নেই। এই খেদ মনস্তাপ ও বেদনা কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের একারই ছিল না, ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের, নেতাজী সুভাষ বসুর, ছিল কোটি বাঙ্গালীর। বাঙ্গালীর শত বর্ষের পুঞ্জিভূত কালিমা, গ্লানি ও অপবাদের অপনোদন করতে আবির্ভূত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রচনা করেন বাঙ্গালী জাতির অমর গাথাঁ। স্বাধীন বাংলাদেশ। উপহার দিলেন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি। সবুজের প্রেক্ষাপটে উদীয়মান রক্তিম সূর্য খচিত পতাকা। বিশ্ব সভায় পরিচিতি। বাঙ্গালী, বাংলাদেশ একই সূত্রে গ্রথিত। অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য। শ্রেষ্ঠতম বিশ্বনেতৃত্বের পংক্তিভুক্ত হলো তার নাম। উচ্চারিত হলো জর্জ ওয়াশিংটন, লেলিন, মহাত্মা গান্ধী, মা ও সেতুং, হোটিমিন, নেলসল ম্যান্ডোলা প্রমুখের নামের সাথে।

বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বার বিকাশ ও স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রথম দেখেন ১৯৪৬ সালে। পাকিস্তান যে বাঙ্গালীদের জন্য নতুন উপনিবেশবাদী শাসন হবে-সেটা তিনি পাকিস্তান হওয়ার আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। পাকিস্তান হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট। আর ১৯৪৬ সালে কলিকাতায় অবস্থানকালে কয়েকজন সমমনা বন্ধু মিলে বঙ্গবন্ধু একদিন সিনেমা দেখতে ঢুকেন শ্যাম বাজারের একটি প্রেক্ষাগৃহে। উদ্দেশ্য সিনেমা দেখা নয়। সিনেমা হলের অন্ধকারে বসে বাঙ্গালী জাতির চেতনার অস্তিত্ব রক্ষার পন্থা হিসেবে রাজনৈতিক প্লাটফর্ম তৈরি, যা পরিণামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সহায়ক হবে। পাকিস্তান হওয়ার পর কলিকাতা থেকে ঢাকায় এসে ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ অর্থাৎ পাকিস্তানের জন্মের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন করেন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী গঠন করেন মুসলিম ছাত্রলীগ, আজ যা ছাত্রলীগ নামে পরিচিত। এই ছাত্রলীগ স্বাধীতনা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪৯ সালের ২৪ জুন প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের প্রথম বিরোধীদল আওয়ামী লীগ। তখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এসবই ঐতিহাসিক সত্য। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ও নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার পথে ঐতিহাসিক পদক্ষেপসমূহঃ

* মার্চ ১ থেকে মার্চ ২৬, ১৯৭০-এ প্রধান প্রধান ঘটনাপঞ্জি।

* মার্চ ১, ১৯৭১ ঃ বঙ্গবন্ধুর পরামর্শক্রমে স্বাধীন বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষধ গঠন হয়।

* ২ মার্চ, ১৯৭১ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেক্রমে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলণ করা হয়।

* ৩ মার্চ, ১৯৭১ ঃ পল্টন ময়দানে ছাত্র সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলণ এবং স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়।

* ৭ মার্চ, ১৯৭১ ঃ রমনা ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, যা পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা। লক্ষনীয় বঙ্গবন্ধুর উক্তিঃ 'রক্ত যখন দিয়েছি-রক্ত আরও দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ' আশু মুক্তিযুদ্ধের ইঙ্গিতবহ।

* ১৫ মার্চ, ১৯৭১ ঃ বঙ্গবন্ধুর প্যারালাল সরকার গঠন। ৩৫ দফা রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কিত নির্দেশ। সেনা ছাউনিতে যাতে রসদ যেতে না পারে, সেনা চলাচল যাতে না হয় সে জন্য রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ও দলীয় কর্মীদের নিয়ে চেক পয়েন্ট স্থাপন। জেনারেল ওসমানীকে বাঙ্গালী সেনা অফিসারের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং ছাত্র ও আনসারদের ট্রেনিং শুরু হয়।

* ১৯ মার্চ, ১৯৭১ ঃ ছাত্রলীগের নিউক্লিয়াসের নেতৃবৃন্দদের ভারতে গিয়ে স্বাধীনতার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়।

* ২৩ মার্চ, ১৯৭১ ঃ সারাদেশে 'পাকিস্তান দিবস' উপলক্ষে পাকিস্তানী পতাকার বদলে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এমনকি বিদেশী দুতাবাসগুলোও বাংলাদেশী পতাকা উত্তোলন করে।

* ২৫ মার্চ, ১৯৭১ ঃ সন্ধ্যায় সম্ভাব্য পাক সামরিক অভিযানের আভাস পেয়ে দলীয় কর্মীদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দেন শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিববাদের-লেখক খোন্দকার মুহম্মদ ইলিয়াসকে বঙ্গবন্ধুরর উক্তি 'আপনারা আশ্রয় পাবেন অস্ত্র পাবেন। সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। সে রাতে সর্বশেষ যিনি অবস্থান করেন সেই ওসমানীকে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক একটি গোপন দলিল প্রদান করা হয়। যেভাবে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেনঃ হাজী গোলাম মোর্শেদ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একজন ঘনিষ্ট সহচর। বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার মূহুর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথে ছিলেন এবং তাকেও পাকবাহিনী বঙ্গবন্ধুর সাথে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। পরবর্তীতে তিনি বর্ণনা করেছেন, কিভাবে বঙ্গবন্ধু পাকবাহিনীর হাতে গ্রেফতার পূর্ব মূহুর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন।

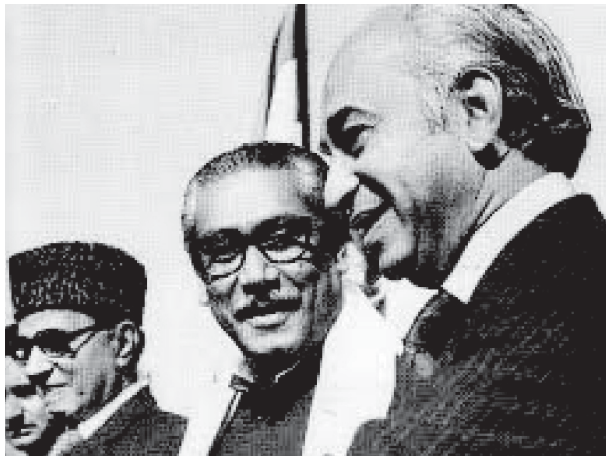

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত বারোটা পার হয়ে গেলে অর্থাৎ ২৬ মার্চ '৭১-এর প্রায় প্রহরে বঙ্গবন্ধু সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফের এক বন্ধুর মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা ইথার তরঙ্গে ছেড়ে দেন। এর পরপরই বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে টেলিফোন বেজে ওঠে। মোর্শেদ টেলিফোন ধরেন। অপর প্রান্ত থেকে বলা হয় 'বঙ্গবন্ধুর দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী যথারীতি ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখন বেতার সেট নিয়ে কি করবো-তা বঙ্গবন্ধুর কাছে জানা দরকার। মোর্শেদ বঙ্গবন্ধুকে একথা জানালে তিনি টেলিফোনকারীদেরকে বেতার সেট নষ্ট করে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তার কিছু পরেই রাত একটার দিকে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন। সে রাতেই ইংরেজীতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী পৌঁছানো হয় চট্টগ্রামের তৎকালীণ আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট জুহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে। তিনি উক্ত ঘোষণার সাইক্লোস্টার করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

তৎকালিন সময়ে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ হান্নান চট্টগ্রামে কালুর ঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেন। ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় এম.এ হান্নান সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী কালুরঘাটস্থ 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকে ৩ বার পাঠ করেন। ঘোষণাটি ইংরেজীতে থাকায় অধ্যাপক আবুল কাশেম সন্দীপ ঘোষণাটি বাংলায় অনুবাদ করেন। পরদিন ২৭ মার্চ একই বেতার কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে দ্বিতীয় দফায় স্বাধীতনার বাণী পাঠ করেন তৎকালীণ মেজর জিয়াউর রহমান। ইংরেজীতে প্রদত্ত Announcement- তিনি পড়লেন.....

"On behalf of our great leader the supreme of commander Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, We hereby proclaim the Independence of Bangladesh and that the government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is the sole Leader of the elected representatives of 75 million people of Bangladesh and the government headed by him is the only Legitimate government of the people of the Independent soverign state of Bangladesh.

সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ স্বাধীনতার ঘোষক ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। সংবিধানের আক্ষরিক অর্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক ও মর্মার্থে জাতির জনক। স্বাধীনতার ঘোষকের কথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কেউ তোলেন নি। তাঁর মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের পর কেউ কেউ তুলেছেন-তবে তির্যকভাবে। সুতরাং এ ধরনের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর হওয়া আবশ্যক। সংবিধান ঠিকভাবে পড়লে এই বিভ্রান্তির কোন অবকাশ থাকে না।
সাংবিধানিকভাবে সব সংশোধনের পরও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাদাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, স্থান ঢাকা, কাল ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। আমি সম্পূর্ণ সাংবিধানিক আলোচনার

মধ্যে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। তবে তার আগে একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসেবে বলতে হয় বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে নেতাজী সুভাষ বসু যখন কুখ্যাত হলওয়েল স্তম্ভ অপসারণের আন্দোলন করেন সেই আন্দোলনর কর্মী হিসেবে শেখ মুজিব ছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আন্দোলনেও জড়িত ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সাল থেকে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সক্রিয়ভাবে। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের কর্মী, ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় শিল্পমন্ত্রীর পদ বরণ, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর বিভিন্ন পর্যায়ে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ, ১৯৬৬ সালে তার বিখ্যাত পূর্ব-পাকিস্তানে স্বাধিকার ছয়দফা দাবি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবকে জড়ানোর প্রতিবাদে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, উক্ত মামলা থেকে মুক্তি ও জনসমাবেশে তাকে বঙ্গবন্ধু অভিধা প্রদান এবং ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়ের কথা মনে রাখতে হবে।

পরবর্তী ঘটনার বিবরণ আমরা মুজিবগনরে ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণা বা Proclamation of Indenpendence থেকে পাবো যা আজকে সংবিধানের অঙ্গ হয়ে গেছে। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ডাক এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং তার পরিণামে সার্বিক অসহযোগ ও হরতালের উল্লেখ করতে হয়।

সংবিধানের আলোকে বর্তমান আকারে যা আছে অর্থাৎ ৫ম সংশোধনীর পরেও যা দাঁড়িয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনার প্রথম পরিচ্ছেদ আছে। আমরা বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

এখানে স্বাধীনতার ঘোষক কোন একজন ব্যক্তি নন বরং আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, আবার ঘোষণার তারিখ ২৭ মার্চ নয়, ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। এর অর্থ দাঁড়ায় সংবিধানে এখানে মুজিবনগরে প্রকাশিত ঘোষণাপত্রকে উল্লেখ করা হচ্ছে এবং এই ঘোষণার মুলবিষয় সংবিধানে অন্তভূক্ত করা হচ্ছে। তাই মুজিবনগরে গৃহীত ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরতে হয়।

ঘোষণা পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ:

THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE
Mujibnagar, Bangladesh
Dated 10th day of April, 1971

WHEREAS, Free election were held in Bangladesh from 7th December 1970 to 17the January, 1971 to elect representatives for the purpose of framing a Constitution. And whereas at these elections the People of Bangladesh elected 167 our of 169 representatives belonging to Awami league.

AND WHEREAS General Uahya Khan Summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd March, 1971, for the purpose of framing of Constitution. AND WHEREAS, the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for an indefinite period.

AND WHEREAS instead of fulfilling their Promise and while still conferring with the representatives of the people of Bangladesh, Pakistan authorities declared an unjust and treacherous war.

AND WHEREAS in the facts and circumstances of such treacherous conduct Banga Bandhu Sheikh Mujibrur Rahman the undisputed leader of 75 million to people of Bangladesh, in due fulfilment of the legitimate right of self determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of inddependence at Dhaka on March 26, 1971, and urged the people of Bangladesh to defend the honour and integrity of Bangladesh.

AND WHEREAS in the coduct of a ruthless and savage war pakistani authorities committed and are still continuously committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others on the civilian and unarmed

people of Bangladesh.
AND WHEREAS the Pakistan Government by levying an unjust war and committing Genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a Government.

AND WHEREAS, the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervor have established effective control over the territories of Bangladesh. we the elected representatives of the people of Bangladesh, as honor bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme, duly constituted ourselves into a Constituents Assembly, and having held mutual consultations, and in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dingnity and Social justice, declare and constitute Bangladesh to be a Sovereign People's Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman and We further resolve that this Proclamation of Independence shall be deemed to have into offect from 26th day march, 1971.

সংবিধানের প্রস্তাবের সঙ্গে মিলিয়ে ঘোষণাপত্রের তর্জমা ও ব্যাখ্যার পূর্বে বলতে হয় এই ঘোষণাপত্র বা Proclamation Independnece কে সংবিধানের ৪র্থ তফসিলের ৩য় অনুচ্ছেদে অঙ্গীভূত করা হয়েছে। তাছাড়া এর বরখেলাফকে রাষ্ট্র সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধাচরণ গণ্য করে 123A Penal Code- এ দন্ডনীয় অপরাধ ধার্য করা হয়েছে। যার প্রাসঙ্গিক অংশ হচ্ছে : Whoever, Within or Without I (Bangladesh), with intent to influence, or knowing it to be likely that he will influence, any person or the whole or any section of the publicd, in a manner likely to be prejudicial to the Safety of 1 (Bangladesh) or to endanger the sovereignty of 1 in respect of all or any the of the territoies lying within its borders, shall by words, spoken or written, or by signs or visible representation, condemn the creation of 1(Bangladesh) 4 (in pursuance of the Proclamation of Independence on the twenty-sixth day of Mach, 1971, or advocate the curtailment or abolition of the sovereignty of 1(Bangladesh) in respect of all or any of the territories lying within its borders, whether by amalgamation with the territories of neighbourign. States or otherwise, Shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to ten years and shall also be liable to fine. বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট বহু রায়ে স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্রকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের একটি আকর দলিল বলে গণ্য করেছেন। সংবিধান রচিত হয়েছে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত গণপরিষদের দ্বারা যা চুড়ান্ত রূপ পেয়েছে ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে। তা হলে ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালের ঘোষণা এবং একজন ঘোষকের কথা যে বলছি সেগুলি কোথায়? অবধারিতভাবে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার আকর দলিলে যেতে হয় যাকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে Proclamation of Independence যা ঘোষিত হয মুজিব নগরে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে যেখানে কেবল স্বাধীনতার ঘোষণা নয়, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি ও স্বাধীনতা ঘোষণার আদি পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সেটা বুঝতে হলে এই ঘোষণাপত্রের বাংলা ভাবার্থ দিতে হয়। ঘোষণাপত্রের

শিরোনাম, তারিখ ও স্থানের উল্লেখের পর বলা হয়েছে ৭ ডিসেম্বর ৭০ থেকে ১৭ জানুয়ারি নির্বাচনের কথা যার উদ্দেশ্য সংবিধান রচনা। নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ এর মধ্যে ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করে যারা আওয়ামী লীগের সদস্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ১৯৭৭ সালে সংবিধান রচনার জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মেলন ডাকেন। সেই আহুত সংসদকে স্বেচ্ছায় ও অবৈধভাবে মুলতবি করা হয়। প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে আলোচনা চলাকালে, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতী যুদ্ধ ঘোষণা করে।
এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ৭৫ মিলিয়ন জনগণের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশর জনগণের বৈধ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায্য অধিকার পরিপূরণে ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায় নিয়মিত স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন, এবং বাংলাদেশের জনগণকে বাংলাদেশের মর্যাদা ও সংহতি রক্ষার জন্য আহ্বান জানান। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ নৃশংস ও বর্বর যুদ্ধ চালিয়ে বাংলাদেশের নিরস্ত্র বেসামরিক অধিবাসীদের উপর গণহত্যা ও বিভিন্ন প্রকার নজিরবিহীন নির্যাতন চালাচ্ছে। এই গণহত্যা নির্যাতন ও নিপীড়নের জন্য জনপ্রতিনিধিগণের পক্ষে সম্মিলিত

হয়ে একটি সংবিধান রচনা করে নিজেদেরকে একটি সরকার দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের জনগন তাদের সাহস, বীরত্ব ও বৈপ্লবিক প্রবণতায় বাংলাদেশের ভূভাগে তাদের কার্যকর জনপ্রতিনিধি কায়েম করেছে।

আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি জনগনের প্রদত্ত ম্যান্ডেট পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ, যে, জনগণের অভিপ্রায় সর্বোচ্চ সেজন্য আমরা আমাদের নিয়ে গণপরিষদ গঠন করে আলাপ আলোচনা করেছি এবং বাংলাদেশের জনগনে জন্য সমতা, মানব মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে। বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌর্ম গণপ্রজাতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ও সংগঠন করছি এবং এতদ্বারা ইত:পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাকে সমর্থন করছি....এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।আইনের এই প্রক্রিয়াকে লেজিসলেশন বাই রেফারেন্স বলা হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রতিষ্ঠিত করতে তারা তখনকার সাড়ে সাত কোটি জনগণের অবিসংবাদিত জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাকে সমর্থন করেন। এইভাবে প্রথমে জনগণ, তারপর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সবশেষে জননেতা একসারিতে যুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের বাঙ্গালিরা জাতি বা নেশন হল, যার অর্থ একটি ঐতিতাসিকভাবে বিবর্তিত জনগোষ্ঠি আপন রাষ্ট্র সৃষ্টি করল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল পার্থক্য এখানে। পাকিস্তানের ভারতের মত ইংরেজ সরকার কর্তৃক ১৯৪৭ সালের Indian Independent Act এর মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব গণপরিষদের উপর হস্তান্তরিত হয়ে অর্জিত হয় কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের পত্তনে। প্রতিষ্ঠা করল বাংলাদেশের জনগণ অর্থাৎ বাঙ্গালিরা। এই যে স্বাধীনতার প্রক্রিয়া তা ঘটনা পরম্পরায় এমনভাবে সন্নিবেশিত যে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যে একজনের নাম আসে তিনি জনগণের নিবাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সংবিধানে বলা হয়েছে ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল, তাহলে আমরা সাংবিধানিকভাকে ২৭ বা অন্য কোন দিনের উল্লেখ করতে পারি না। বাস্তবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের তারিখ ১০ এপ্রিল ১৯৭১, তাহলে ২৬ মার্চ কিভাবে ? হয় এই জন্যে যে ঘোষণাত্রের শেষে বলা হয়েছে যে ঘোষণাপত্র বা Proclamation of Independent ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে গণ্য করা হবে। এই ভাবে ঘোষণাপত্র শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ডাকের দিনকেই সমর্থন ও অনুমোদন করে। তাহলে সাংবিধানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা দিন আমরা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ছাড়া আর কোন তারিখ বলতে পারি না। স্থান সম্বন্ধে দেখতে গেলে দেখতে পাব ঘোষণাপত্র ঘোষিত হয়েছে মুজিবনগের আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা থেকে যা ঘোষণাপত্রেই বলা আছে। সাংবিধানিকভাবে স্থানের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথমে ২৬ মার্চ তারিখে দেন শেখ মুজিব ঢাকাতে যা সমর্থিত হয় ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে। সাংবাবিধানিকভাবে প্রথমে ঘোষণা ঢাকায়, এর সমর্থন ও অনুমোধন মুজিবনগরে, আর কোন স্থানের অনুপ্রবেশের অবকাশ নেই, সুতরাং চট্টগ্রাম বা অন্য কোন স্থানের অবস্থান সাংবিধানের অন্তর্গত নয়। সাংবিধানের প্রস্তাবনার প্রথম অনুচ্ছেদ বাংলাদেশের জনগণের জাতি হিসেবে আত্মানিয়ন্ত্রণাধিকার বা Right of Delft determination এর ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠার কথা দুই-ই বলা আছে। তবে আমরা পাই প্রথম অংশে ঘোষণা, দ্বিতীয় অংশে প্রতিষ্ঠার কথা আছে, আছে একটি জাতির স্বাধীন ও সার্বভৌম আত্মবিকাশের কথা।

আইনে এই দুরুহ দায়িত্ব পালন করে জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আর প্রতিনিধিদের মুখপাত্র হয়ে আসেন তার স্বীকৃত নির্বাচিত নেতা! এইখানে গণতন্ত্রের এক গুরত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটা হচ্ছে জনতা ও নেতার সম্পর্ক অর্থাৎ জনগণের নিবাচিত প্রতিনিধগণ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এরং তারা ঘোষণা দিচ্ছেন এরপূর্বে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতা অর্থাৎ জনগণের নেতা যে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন তাকে অনুমোদন করে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১৭৭৬ সালে যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করল, এই স্বাধীনতা রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান রচয়িতাদের বলা হত Family founding fathers বা প্রতিষ্ঠাতা জনকবৃন্দ। এই রেওয়াজ বা কনভেনশন গত দুই বৎসর ধরে অন্যান্য রাষ্ট্রের ব্যাপারে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমাদের বর্তমান সংবিধান ত্রয়োদশ সংশোধনসহ একধিকবার স্থগিত থাকার পরও সেই ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যে প্রথম সংবিধান রচিত হয় তা আজও বলবৎ আছে, এবং দ্বাদশ সংশোধনীর পর কাঠামোগতভাবে প্রায় ১৯৭২ সালের অসংশোধিত সংবিধানের অবস্থায় ফিরে গেছে। এই সংবিধান রচিত হয় যে গণপরিষদের দ্বারা এর সদস্যরা হচ্ছেন ১৯৭০ সালে ঐতিহাসিক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ এবং এরাই ১০ এপ্রিল ৭১ সালে মুজিবনগরে নিজেদের গণপরিষদ গঠন করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সঙ্গে আমরা

আগেই দেখেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণাকে Confirm বা অনুমোদন করেন। সবদিক থেকে এই গণপরিষদের সদস্যবৃন্দকে প্রতিষ্ঠাতা জনক বলা যায়।

আবার এই প্রতিষ্ঠিতা জনকবৃন্দের নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রথমে নির্বাচনের সময়ে আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে তিনি নির্বাচিত সদস্যদের নেতা, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে Proclemation of Independence এর বলে প্রেসিডেন্ট ও সংবিধান রচনায় সময়ে প্রধানমন্ত্রী রুপে এই ফাউন্ডিং ফাদারদের নেতা। সংবিধানের মর্মার্থে তিনি জাতির জনক। আজকাল অনেকে এমন কি যারা তার কাঠোর সমালোচক তারাও শেখ মুজিবকে ফাদার অব নেশন বা জাতিক জনক বলছেন। তাহলে সংবিধানের আক্ষরিক অর্থে একদিকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষক, মর্মার্থে পাচ্ছি তিনি ফাউন্ডিং ফাদারদের নেতা। দুটোকে জড়িয়ে আমরা পাচ্ছি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। ১৯৭২ সালের ২৫ মার্চ রাতে বর্বর পাকবাহিনী অতর্কিতে বাংলার জনগণের ওপর মরণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, ছাত্র ও যুবকরা তাদের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে হানাদারদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছে। সারা বাংলাদেশ হানাদার বাহিনীকে নির্মূল করার জন্য দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছে। সে সময় বঙ্গবন্ধুকে আটকের গোটা সময় একটি

প্রশ্নই ইয়াহিয়া খানকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে পাক সরকারকে। যুদ্ধরত বাংলাদেশে তখন বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য মানুষ রোজা রেখেছে। নফল নামাজ আদায় করেছে। মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর হয়েছে। শত্রু-মিত্র সবাই আজ এক বাক্যে স্বীকার করেন, সেদিন বঙ্গবন্ধুই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। তখনও মানুষ জিয়ার নাম তেমন শোনেননি। বঙ্গবন্ধু দিব্য দৃষ্টিতে এটা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন বলেই পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেননি। তাছাড়া, পালাবার মতো নেতা বঙ্গবন্ধু কোনকালেই ছিলেন না। দেশ ও জনগণের জন্য হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করার মতো মনোবল তিনি সবসময় পোষণ করতেন। অতিবড় শত্রু ও তাঁর অসীম সাহসের প্রশংসা করেন। মৃত্যুর সময়ে ও তিনি তাঁর হত্যাকারীদের তর্জনী তুলে ধমক দিয়েছেন বলে হত্যাকারীরা স্বীকার করেছে। প্রয়াত প্রখ্যাত অ্যান্থনী ম্যাসকারেন হাস-তার "দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ" (The Rap of Bangladesh) এর এক জায়গায় লিখেছেন "পাঞ্জাবী রাজনীতিবিদদের শঠতায় অতিষ্ট হয়ে আওয়ামী লীগ ফিরোজ খান নুনের পক্ষ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে ভিন্ন পথে চলার সিদ্ধান্ত নেন। শেখ মুজিব সেদিন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলেন-"আমাদের স্বাধীনতা পেতে হবে" তিনি আরও বলেন, "আমাদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও থাকতে হবে। আমি অবশ্যই এসব দেখাব।" উক্ত উক্তি বঙ্গবন্ধু করেন তখন ১৯৫৮ সাল। ফিরোজ মন্ত্রী সভার পতন হয়েছে এবং চুন্ডীগড় সরকার তার স্থলাভিষিক হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বেতার ভাষণে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, "ঐ ব্যক্তি (মুজিব) ও তার দল পাকিস্তানের দৃশ্যমান। তারা পূর্ব পাকিস্তানকে সার্বিকভাবে পৃথক করতে চায়।"

এবার তাকে শাস্তি পেতেই হবে। ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দেবার সব ব্যবস্থার সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু সময়াভাবে অর্থাৎ তার আগেই পদত্যাগে বাধ্য হওয়ায় সেটা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ইয়াহিয়া খান কথিত 'সার্বিকভাবে পৃথক ভাবে (টোটাল সিসেসন) কি স্বাধীনতা নয় ?

সফিকুর রহমান সম্পাদিত "স্বাধীনতার স্বপ্ন ও আজকের প্রেক্ষাপট" যেভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছি শীর্ষক জিয়াউর রহমানের একটি লেখা সংকলিত হয়েছে। এটি ১৯৯২ সালে লেখা এবং তা প্রথম সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তিনি লিখেছেন-"৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রীন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম।" এই গ্রীন সিগন্যাল ও চূড়ান্তরূপ জিয়া যে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছেন-তা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। জিয়া বেঁচে থাকাকালীণ কখনো নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে দাবী করেননি। পৃথিবীর প্রতিটি জাতির একজন পিতা থাকে। যেমনঃ ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী এবং পাকিস্তানের কায়েদা আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তেমনি জাতির পিতা হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রতিবিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আমাদের স্বাধীতনা ও সার্বভৌমত্বকে কখনোই মেনে নিতে পারিনি। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক বঙ্গবন্ধুকে তারা নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত হয়েছিল দৈহিকভাবে। মুছে ফেলতে চেয়েছিল কোটি কোটি মানুষের হৃদয় থেকে । কিন্তু বঙ্গবন্ধু চিরঞ্জীব ও অমর। তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন ৫৫ হাজার বর্গমাইলে সবুজ শ্যামল এই গাঙ্গের বদ্বীপে। বাংলাদেশের মতই শ্বাশত চিরায়ত ও দেদীপ্য বঙ্গবন্ধুর অস্তিত্ব। বাংলাদেশকে মুছে ফেলতে পারলেও বঙ্গবন্ধকে মুছে ফেলা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই সত্য বিস্মৃত হয়ে অপগান্ডের মত যারা ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টায় লিপ্ত, তারা বাস্তবিকই

করুণার পাত্র। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না লে পৃথিবির বুকে হয়তো একটি স্বাধীন সার্বভৌমত্ব দেশ পেতাম না। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মানেই স্বাধীনতা, শেখ মুজিব মানেই বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাতে কোন মতানৈক্য কোন দ্বিধাদ্বন্ধ থাকতে পারে না। সেইসব দিনগুলোতে বাংলাদেশের জনগণ শেখ মুজিব ছাড়া আর কাউকে নেতা হিসেবে পায়নি এবং নেতা হিসেবে মানেনি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই

আওয়ামীলীগের পক্ষে নৌকা মার্কা নিয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য একমাত্র মুজিব ছাড়া আর কেউ সাতশটি বছর জেলে কাটাননি। সেই দুঃসহ দুর্দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই ছিলেন জাতির নেতা আশা ও নির্দেশনার একমাত্র অবলম্বন। ১৯৭১ এর ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লাখো মুক্তিকামী মানুষের সামনে যে ভাষন দিয়ে সমগ্র দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত আর সংগ্রামী করেছিলেন তিনি অন্য কেউ নন, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।

এরকমের তেজোদ্দীপ্ত বাণী কেউ সেদিন ছড়াতে পারেনি। ১৯৭১ সালের সেই ভয়াবহ যুদ্ধের দিনে সারা পৃথিবীর পত্র পত্রিকায় তথা বিশ্ব মিডিয়াই বাংলাদেশের নরহত্যাযজ্ঞের ঘটনা তুলে ধরে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কথা তুলে ধরেছিল। সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজী রেখে সে সংগ্রাম করেছিল তা জয বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানে। মুক্তিযোদ্ধা আর স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষে যে শ্লোগান তোলা হয়েছিল তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব। জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো।

১৯৭১ সালের স্বাধীতনার মুক্তিসংগ্রামে যে গানগুলো মানুষের মনে সাহস যুগিয়েছিল যুদ্ধে যাবার সে গাসগুলো মুজিব ভাইয়া যাওরে। নির্যাতিত দেশের মাঝে জনগণের মনও ওরে মুজিব ভাইয়া যাওরে। শোন একটি মুজিবরের কণ্ঠ থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ বলি ইত্যাদি আরো কত রকম সংগ্রামী গান লেখা হয়েছিল মুজিবকে ঘিরে। তারপর ওকি বলে দিতে হবে কে স্বাধীনতার মহানায়ক ? কে স্বাধীনতার ঘোষক ? বাংলাদেশ নামক দেশটির প্রতিষ্ঠাতা কে ? একটি দেশের জন্য, একটি জাতির জন্য, একটি ভাষার জন্য যে নেতা বছরের পর বছর জেল, জুলুম, নির্যাতন ভোগ করেছেন তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সুতরাং বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাংলাদেশের কোন সঠিক ইতিহাস তৈরি হতে পারে না।

বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মহানয়ক ও ইতিহাসের সর্বশেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু অপ্রিয় সত্য যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বেঁচে থাকতে পারেননি, ঘাতকরা বেঁচে থাকতে দেয়নি। তিনি জানতেন না, শয়তান কখনো মানুষ হয় না। হায়না রূপী পশুরা কখনো মানুষের যে উপকারি তাকে শ্রদ্ধা জানাতে জানে না। যার ফলে দেশ স্বাধীন হবার কিছুদিন পরেই স্বাধীনতা বিরোধী দেশী বিদেশী ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু নিজের জীবন দিয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টি করলেও এখন বাংলাদেশের সর্বত্র অপরাজনীতিবিদদের বেশ্যা রাজনীতিকের পদভারে প্রকম্পিত রক্ত বাংলাদেশ। আমি বলতে চাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয় কোন বিতর্ক থাকতে পারে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা, স্বাধীনতার ঘোষক, বাংলা ভাষাভাষী মানুষের অবিসংবাদিত নেতা ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী।

শতাব্দীর মহানায়ক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার পর বাঙালী জাতিকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে যাননি কিংবা যাওয়ার চিন্তাও করেননি। কিন্তু কিছু সমালোচক প্রশ্ন রাখেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মতো বড় ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজ করেও কি করে নিজের বাসভবনে অবস্থান করে পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পথ প্রশস্ত করেন ? তাদের মতে, তারতো উচিত ছিল ধরা না পড়ে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের নেতারাতো ধরা দেন না। নেতাজী সুভাষ বসুতো ধরা দেননি ইত্যাদি। এর অনেকগুলো ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রথম ব্যাখ্যা হচ্ছে, সে সময়কার জিওপলিটিক্যাল পরিস্থিতি। বঙ্গবন্ধু আশা করেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রশ্ন আমেরিকার সমর্থন পাওয়া যাবে। সেই মোতাবেক তিনি ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করেন। তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস্ ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুকে পরিস্কার জানিয়ে দেন যে, এ ব্যাপারে আমেরিকা কোন সহাযোগিতা করবে না। বঙ্গবন্ধু তাঁর সকল নেতা কর্মীকে ভারতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে তাদের জানিয়েছিলেন যে, ভারত ও রাশিয়ার সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে। দেশ দু'টি যথাসাধ্য সাহায্য ও সমর্থন যোগাবে। তিনি স্বয়ং ভাবতে যাননি যে, তাহলে আমেরিকা দারুণভাবে রেগে যাবে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে বৃহৎ শক্তির এ অঞ্চলে অনিবার্য হয়ে পড়বে। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য অগ্রসরমান সপ্তম নৌ-বহর বঙ্গোপসাগরের মোহনায় এসেই হঠাৎ করে মোড় ঘুরিয়ে নেয়

এবং তার বদলে ইয়াহিয়াকে সরিয়ে ভূট্টোকে বসিয়ে বঙ্গবন্ধুকে কারামুক্ত করে বাংলাদেশে পাঠায়। মার্কিন প্রশাসনের মেষ ভরসা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধুই তার দেশকে তাদের ভাষার ভারত রাশিয়ার খপ্পর থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। তাই পাকবাহিনীর হাতে গ্রেফতার বরণ ছিল বঙ্গবন্ধুর আরেকটি প্রজামন্ডিত রাজনৈতিক কৌশল যা আমাদের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি জড়িয়ে পড়াকে অতীব চাতুর্যের সঙ্গে প্রতিহত করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুক্তিযুদ্ধের নেতাদের ধরা পড়ার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধের বহু নেতাকে ফরাসী বাহিনী আটক করেছিল।

নেলসন ম্যান্ডেলা দিক্ষণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ বাহিনীর হাতে প্রায় তিন যুগ আটক ছিলেন। এতে অনুকূল বিশ্বজনমত সৃষ্টি হয় এবং শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে স্বদেশবাসীরেদ ঘেরাও তীব্রতর হয়। বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আটকের গোটা সময় এই একটি প্রশ্ন ই ইয়াহিয়া খানকে দেশে বিদেশে মোকাবেলা করাকে হয়েছে। বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে পাকিস্তান সরকারকে। যুদ্ধরত বাংলাদেশে তখন বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য মানুষ রোজা রেখেছে। নফল নামাজ আদায় করেছে। মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর হয়েছে। শত্রু-মিত্র সবাই আজ

এক বাক্যে স্বীকার করেন, সেদিন বঙ্গবন্ধুই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু দিব্য দৃষ্টিতে এটা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন বলেই পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেননি। তাছাড়া, পালাবার মতো নেতা বঙ্গবন্ধু কোনকালেই ছিলেন না। দেশ ও জনগণের জন্য হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করার মতো মনোবল তিনি সবসময় পোষণ করতেন। অতিবড় শত্রু ও তাঁর অসীম সাহসের প্রশংসা করেন।

মৃত্যুর সময়ে ও তিনি তাঁর হত্যাকারীদের তর্জনী তুলে ধমক দিয়েছেন বলে হত্যাকারীরা স্বীকার করেছে। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকালের খাতায় পাতায় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী এবং শতাব্দীর মহানায়ক হিসেবে চিরদিন অমর ও অক্ষয় হয়ে থাকবেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের গৌরব এবং অহংকার। তাই স্বাধীনতার জনক বঙ্গবন্ধুর অবদান সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ–

বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রস্ট গঠন করেছেন। তিনি বায়তুল মোকাররম মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার্থে পূর্বপার্শ্বস্থ স্পোটিং ক্লাবগুলিকে স্থানান্তর করেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও টঙ্গীর বিশ্ব ইজেতেমার জন্য জায়গা বরাদ্ধ করেছেন। তিনি কাকরাইল মসজিদের সম্প্রসারণ, মাদ্রাসার শিক্ষাকে সম্প্রসারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করেছেন। এছাড়া তিনি আইয়ুব ইয়াহিয়ার আমলে ঢাকা (রেসকোর্সে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ঘোড় দৌড় বন্ধ, সরকারি পর্যায়ে আইন পাশ করে মদ আমদানী বন্ধ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরিতে সরকারিকরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বাধীনতার পরবর্তী ৪৪ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ, পৌনে দু'লাখ শিক্ষকের নিয়মিত রেশনের মাধ্যমে চাল, ডাল, গম, লবন, চিনি, সরিষা ও সয়াবিন, তেল, বাটার অয়েল, গায়ে মাখা ও কাপড় কাঁচা সাবাস, সেমাই ও ব্লেড পর্যন্ত প্রদানের ব্যবস্থা, ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা মূল্যে বই বিতরণ ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক প্রদান, ১৫ হাজার নতূন বিদ্যালয় সরকারিকরণ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা অধ্যাদেশে স্বায়ত্বশাসন প্রদান, রিকশা শ্রমিকদের জন্য সমবায় পদ্ধতিতে অটোরিকশা প্রদানের ঘোষণা দান, শ্রমিক কর্মচারীদের (আনিগত দিক বিরোচনা করে) স্বার্থে শ্রম আদালত পুনর্গঠন, অসহায় কৃষকদের স্বার্থে ১৫ বৎরের খাইখেলাপী চুক্তিকে ৭ বৎসরের পরিণত, বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে হকার্স মার্কেট প্রতিষ্ঠা, সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর সরকারের আমলে ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার (ও আইসি) সদস্যপদ লাভ করা হয়। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩-এর আরব ইসরাইল যুদ্ধে আরবেদের পক্ষে ১ লাভ পাউন্ড চা, ২৮ সদস্যের মেডিকেলটিমসহ ৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে প্রেরণ করেছেন। বিশ্বের মানচিত্রে কোন জাতি একদিনে তাদের কাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভ করেনি। বাংলাদেশও একদিনে স্বাধীনতা লাভ করেনি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীতনা যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় সূচিত হলেও ১৯৪৬ সালেই বঙ্গবন্ধু প্রথম স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন। তারপর ৫২'র আন্দোলন, ৬ দফা, ৭০ এর নির্বাচন এবং পরিশেষে ৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ ৯মাস ব্যাপি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বে রচিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলনের সাথেই সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা।

তথ্যসূত্র :

১। দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ
২। স্বাধীনতার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৩। শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ।

ভোটের মাঠে জোট

মোস্তফা কামাল

ভোট-জোট। লক্ষ্য আর উপলক্ষ্যের বিষয়। গত কয়েক দশক ধরে নির্বাচনকে লক্ষ্য করে ভোটের অংক মেলাতে জোটকে উপলক্ষ্য করা রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জোট সংস্কৃতি আবারও তুঙ্গে। বিগত কয়েকটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতের বাইরে হাতে গোণা কয়েকটি দল থাকলেও এবারের চিত্র ভিন্ন। জোট-মহাজোট, ঐক্যজোটে ভাঙা-গড়ার খেলাও জমেছে বেশ। একুল ভেঙে ওকুল গড়ার জোট রাজনীতির মেজাজে এবার আরো ভিন্নতা।

আওয়ামী লীগ-বিএনপিসহ ভোটের মাঠে কমছে কম দশ-এগারোটি জোট সক্রিয়। চলছে নিত্য-নতুন আরো জোট তৈরির উদ্যোগ ও আয়োজন। ভোটের অংক সবক্ষেত্রে মুখ্য হচ্ছে না। ভোট থাক বা না থাক নামসর্বস্ব প্যাডনির্ভর কিছু দলও এবার পলিটিক্যাল ভ্যালু পাচ্ছে। ক্ষুদ্র হলেও তারা বড়দের জোটে ঢুকছে। বেরুচ্ছে। ভোট কতো আছে-এ প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট জবাব না থাকলেও জোটে শরীকানা বা আসন ভাগাভাগিতে দর কষাকষির কমতি নেই। ভাগাভাগি বা মিলে গরমিল হলে জোট ছাড়ার হুমকি দেয়। এ জোট ছেড়ে অন্য জোটে ভিড়েও যাচ্ছে সমাদরের সঙ্গে। একই নামের সংগঠন ব্র্যাকেটবন্ধি হয়ে বিভিন্ন জোটে শরীকানা নিচ্ছে। মাঠে শক্তি-সামর্থ না থাকলেও, এমন কি নিবন্ধন না থাকলেও জোটগতভাবে তারা কিছু একটা। ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বা সমাবেশেও জোরালো বক্তব্যে রাখার সুযোগ মিলছে। অনেকটা অনায়াসে পজিশন মিলছে বড়দলের বড় নেতার পাশে। আবার জোটের ভেতরে জোট এবং একদলের একাধিক জোটে শরীক থাকা এবারের নতুনত্ব। জোটভুক্ত দলগুলোর নির্বাচনী বৈধতা তথা নিবন্ধনের তথ্যও করুণ। ক্ষেত্রবিশেষে হাস্যকরও। সংখ্যা বিচারে সব চেয়ে বড় জোটের নেতা সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তার জাতীয় পার্টির অধীনে রয়েছে ৫৯টি দল। এর নাম সম্মিলিত জাতীয় জোট। এরশাদের জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটেরও শরীক। সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় পজিশনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট। এই জোটের প্রধান দল ২০ দলের নেতৃত্বের পাশাপাশি ড. কামালের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টেরও অন্যতম শরীক। বিএনপি ছাড়া জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের বাকি শরীকরা হচ্ছে-গণফোরাম, জেএসডি, ঐক্য প্রক্রিয়া ও নাগরিক ঐক্য। বিকল্পধারাসহ আটটি দলের নেতৃত্বে চলছে সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট। বাকিরা হচ্ছে- বিএলডিপি, বাংলাদেশ ন্যাপ, এনডিপি, লেবার পার্টি, মাইনোরিটি ঐক্যফ্রন্ট, জাতীয় জনতা পার্টি, বাংলাদেশ জনদল। তাতের মধ্যে নিবন্ধন রয়েছে মাত্র দুটি দলের। ব্র্যাকেটবন্ধি হয়ে এসব দলের কয়েকটি আবার ২০ দলেও রয়েছে। এমন কি বিকল্পধারাও এখন দুটি। আর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ গুরুত্বের সঙ্গে নেতৃত্ব দিচ্ছে ১৪ দলীয় জোটের। আবার মহাজোটও অস্বীকার করছে না।

জোট প্রশ্নে ভোট বেশ প্রাসঙ্গিক। দলও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু দেশে বর্তমানে জোটের সঙ্গে দলও অগুণতি। নির্বাচন কমিশনের হালখাতায়, দেশে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা ৩৯। আর অনিবন্ধিত দল অন্ড়ত ২০০। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটে নিবন্ধিত দল আটটি। বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটে নিবন্ধিত দল ৮। জাতীয় পার্টির নেতৃত্বাধীন ৫৯ দলীয় জোটে নিবন্ধিত দল রয়েছে তিনটি। সিপিবি-বাসদের নেতৃত্বাধীন আট দলের জোটে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা তিন। আর ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন বহুল আলোচিত জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা তিনটির মতো। নিবন্ধিত বাকি ১৫টি দলের মধ্যে সংসদে প্রতিনিধিত্ব আছে মাত্র একটির।

এটির নাম বিএনএফ। জোটে দলের সংখ্যা বিচারে বিএনপির সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদাও কম নন। তার দলের নাম তৃণমূল বিএনপি। তিনি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটে শরিক হয়েছেন। আবার তার নিজেরও নেতৃত্বাধীন জাতীয় জোটে ৯টি দল রয়েছে বলে দাবি তার।

১৪ দলের কাছে ব্যারিস্টার হুদা তার দেয়া দলের তালিকা অনুযায়ি দলগুলো হচ্ছে- তৃণমূল বিএনপি, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স, সম্মিলিত ইসলামিক জোট, কৃষক শ্রমিক পার্টি, একামত আন্দোলন, জাগো দল, ইসলামিক ফ্রন্ট ও গণতান্ত্রিক জোট। এর মাঝে আবার সম্প্রতি ৮-দলীয় বাম গণতান্ত্রিক জোট নামে একটি ফ্রন্টও ঘোষণা হয়েছে। সংখ্যা হিসাবে জোটরাজ্যে কেউই কম নয়। জোটের সঙ্গে ভোটের হিসাব প্রাসঙ্গিক হলেও আপেক্ষিক। বিতর্কিতও। এক সংখ্যায় বলার মতো নয়। তবে, বিগত অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনায় বিভিন্ন সময়ের ভোটের শতাংশের একটা হিসাব উলেখ করা যায়।

১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ভোট পায় ৩১.৮১ শতাংশ। আর ৩০.৮১ শতাংশ ভোট পেলেও আসন বেশি পেয়েও ক্ষমতাসীন হয় বিএনপি। ৯১-তে অন্য দলগুলোর মধ্যে জাতীয় পার্টি ১১.৯২, জামায়াত ১২.১৩, জাসদ ১.৫৪, সিপিবি ০.৯১, ন্যাপ ০.৭৬ শতাংশ ভোট পায়। ১৯৯৬-তে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ভোট পায় ৩৭.৪৪, বিএনপি ৩৩.৬১, জাতীয় পার্টি ১৬.৪০, জামায়াত ৮.৬১, জাসদ ০.২৩, সিপিবি ১.১৯ শতাংশ। ২০০১ সালের অষ্টম সংসদ নির্বাচনে ভোট বাড়ে বিএনপির ৪০.৮৬। আওয়ামী লীগেরও ভোট বেড়ে দাঁড়ায় ৪০.২১। ওই নির্বাচনে অন্য উলেখযোগ্য দলের মধ্যে জাতীয় পার্টি ৭.২৬ এবং জামায়াত ৪.২৯ শতাংশ। ২০০৮ সালে নবম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোট ৪৮.০৪, বিএনপি ৩২.৫০, জাতীয় পার্টি ৭.০৪, জামায়াত ০.৩৭, জাসদ ০.৭২। পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম সংসদ নির্বাচনে অনেক বেশি দল অংশ নেয়। কিন্তু নবম সংসদ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের বিধানের কারণে ভোটের সঙ্গে ভোটারের হিসাবও পাল্টে যায়। আর স্বাভাবিকভাবেই কমে যায় ভোটে অংশ নেয়া দলের সংখ্যা। ২০১৪-তে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এসে হিসাবে আরো ওলট-পালট। প্রেক্ষিতও ভিন্ন। ওই নির্বাচনে ৩৯টি নিবন্ধিত দলের মধ্যে অংশ নেয় ১২টি দল। এতে অংশ নেয়নি বিএনপি এবং দলটির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের কোনো শরীকই। ওই নির্বাচনে ১৫৩ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ইসির তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচন হওয়া আসনগুলাতে ভোট পড়েছে এক কোটি ৭৩ লাখ ৯২ হাজার ৮৮২। হিসাবে তা মোট ভোটের ৪২.০৪ শতাংশ। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শরিক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ ২৪টি আসনে নির্বাচন করে। দলটির প্রাপ্ত ভোট মোট ভোটের ১.১৯ শতাংশ। আর বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ১৮টি আসনে প্রার্থী দিয়ে প্রাপ্ত ভোট মোট ভোটের ২.১০ শতাংশ। ১৪ দলের আরেক শরীক গণতন্ত্রী পার্টি একটি আসনে প্রার্থী দিয়ে পেয়েছে দুই হাজার ৩১ ভোট। যা মোট ভোটের ০.০১ শতাংশ।

বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট একটি আসনে নির্বাচন করে পেয়েছে দুই হাজার ৫৮৫ ভোট, যা মোট ভোটের ০.০২ শতাংশ। একইভাবে গণফ্রন্ট একটি আসনে দুই হাজার ৭১৭ ভোট পেয়েছে, যা মোট ভোটের ০.০২ শতাংশ। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস দুটি আসনে পায় পাঁচ হাজার ৭২৫ ভোট। যা মোট ভোটের ০.০৩ শতাংশ। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ছয়টি আসনে ভোট পায় সাত হাজার ১২০। যা মোট ভোটের ০.০৪ শতাংশ। এছাড়া বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ ২২টি আসনে নির্বাচন করে ভোট পায় এক লাখ সাত হাজার ৭৯০, যা মোট ভোটের ০.৬৩ শতাংশ। জাতীয় পার্টি-জেপি ২৮টি আসনে পায় এক লাখ ২৪ হাজার ৩৮৯ ভোট পায়। যা মোট ভোটের ০.৭৩ শতাংশ। বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন তিনটি আসনে নির্বাচন করে ভোট পায় এক লাখ ৭৭ হাজার ৪৪৯, যা মোট ভোটের ১.০৪ শতাংশ। অর্থাৎ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্র জাতীয় পার্টি ছাড়া অন্যদের ভোট একেবারেই নগণ্য।

কোনো দেশের সাধারণ নির্বাচন আসলে সাধারণ বিষয় নয়। এ নির্বাচন দেশের ভাগ্য পরিবর্তনের পথ। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক দেশে দেশে সাধারণ নির্বাচনের আগে নির্বাচনী জোট গঠনের সংস্কৃতি রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই জোটভুক্ত দলগুলোর মধ্যে নীতি-আদর্শের তেমন ব্যাপার থাকে না। ভোট তথা ক্ষমতাই সেখানে মূখ্য। বহুদলীয় জোটের সফল সরকার দেখা গেছে

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। ক্ষমতার ভাগাভাগি মালয়েশিয়ায়ও। জার্মানির ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেলের সরকারও কোয়ালিশন সরকার। জনগনও বিভিন্ন নামের কোয়ালিশন সরকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে কোয়ালিশন সরকার ব্যবস্থা বছর কয়েকের হলেও জোটপ্রথা বেশ পুরনো। আশির দশকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর জোট রাজনীতি গুরুত্ব পেতে থাকে। এর আগে, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো মুসলিম লীগ ও সদ্য গঠিত ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ একটি সংসদীয় ঐক্য গঠন করে। তবে, পরে তা টেকেনি। উলেখ্য স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগের ব্যানারে।

জোট রাজনীতি পর্যালোচনায় এ ধরনের কিছু ঘটনা বাদ দিলে দেখা যায়, আদর্শের চেয়ে ক্ষমতাই বেশি ফ্যাক্টর। মাঠের রাজনীতিতে ডান-বাম, সাম্প্রদায়িক-অসাম্প্রদায়িক, উন্নয়ন-সংবিধান ইত্যাদির কথা বলা হলেও ভোট ও ক্ষমতার প্রশ্নে সবাই একার।

জোট রাজনীতিতে বাংলাদেশে সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাস বেশ প্রাসঙ্গিক। ১৯৭৩ সালে প্রথম সংসদ নির্বাচন হয়েছিল সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থার আওতায়। এরপর ১৯৭৯ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত চারটি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতির অধীনে। তবে ১৯৯৬ থেকে সর্বশেষ ২০০৮ সালের পর পর তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায়।

১৯৭৩ সালে কোনো জোটের রাজনীতি ছিল না। ছিল না ইসলামপন্থী কোনো দলের অংশগ্রহণও। মোট ৩০০ আসনে একক ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছিল ২৯২ আসনে। ওই সময় বিরোধীদলে ছিল জাসদ, ন্যাপ (মোজাফফর)। যারা এখন সরকারি জোটের অন্যতম শরিক।

ওই নির্বাচনে ন্যাপ (মোজাফফর) ২২৪ আসনে প্রার্থী দিয়ে পেয়েছিল মাত্র একটি আসন। আর জাসদও ২৩৭ আসনে প্রার্থী দিয়ে পায় একটি আসন। ভাসানী ন্যাপ ১৬৯ আসনে প্রার্থী দিয়ে পায় একটি আসন। স্বতন্ত্ররা জেতেন চারটি আসনে। তখন গোটা প্রেক্ষিতই ছিল ভিন্ন। ওই সময় কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জোট গঠনের কথা না বললেও, নির্বাচনের পরপরই মস্কোপন্থী মোজাফফরের ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি নেতারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করার আহ্বান জানান।

১৯৭৩ সালের মে মাসে এ তিন সংগঠনের মধ্যে একটি জোট হয়। ধীরে ধীরে তা অন্যান্য দলের দিকেও গড়ায়। চার মাসের মধ্যে তিয়াত্তরের সেপ্টেম্বরে সরকার রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিকে সামনে রেখে প্রগতিশীল সংগঠনগুলোকে নিয়ে একটি ঐক্যফ্রন্ট গঠন করবে বলে ঘোষণা দেয়। অক্টোবরে গঠিত হয় বহুল আলোচিত 'গণ ঐক্যজোট' । ১৯ সদস্যবিশিষ্ট ওই কমিটিতে ১১ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের। ন্যাপ মোজাফফরের পাঁচজন। আর তিনজন সিপিবি থেকে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। তখনকার রাজনীতিতে আলোচিত হলেও জোটটি সংসদীয় নির্বাচনে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ নির্বাচন হয়েছিল এর আগে মার্চে।

৭৯-তে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনেও এই গণ ঐক্যজোটের কোনো প্রতিফলন ছিল না। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নেয় আবদুল মালেক উকিল ও মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে দুই ভাগে। মোজাফরের ন্যাপ একতা পার্টি, জাসদও আলাদাভাবে নির্বাচন করে। আওয়ামী লীগের মালেক গ্রুপ ২৯৫ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয় ৩৯টিতে। আর মিজান গ্রুপ ১৮৪ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জেতে দুটিতে। ন্যাপ (মোজাফফর) পায় এক আসন। জাসদ পায় ৮ আসন। মুসলিম লীগ ও ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (পরবর্তীকালে জামায়াতে ইসলামী) ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে ২৬৬ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২০টিতে বিজয়ী হয়। তারা ওই সময় নবগঠিত বিএনপির সঙ্গে ঐক্য

করেনি। এরপর ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৭৬ আসন পায়। জামায়াতে ইসলামীর সেটিই প্রথম নির্বাচন। তারা পায় ১০ আসন।

এছাড়া- ন্যাপ ২, যুক্ত ন্যাপ ৫, সিপিবি ৫, আসন পায়। কিন্তু কোনো জোট করেনি। এরশাদের অধীনে দ্বিতীয় ও সংসদের ইতিহাসে চতুর্থ নির্বাচনকে কোনো উদাহরণ হিসেবে ধরা হয় না। তবে, ওই নির্বাচনে আসম রবের ৭৩ দল নিয়ে সম্মিলিত বিরোধীদলীয় নেতা হওয়ার একটি জোট চর্চা হয়েছে ওই নির্বাচনে। এরশাদ পতনের পর পরিবর্তিত রাজনীতির আলোকে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন হয় ১৯৯১ সালে। ওই নির্বাচনের পূর্বাপরেই জোট রাজনীতিতে আসে নয়ারূপ। এর আগে, আন্দোলনের মাঠে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কখনো ৮দল, কখনো ১৫ দল, বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দল ধরনের ঐক্যের ভিন্নমাত্রার প্রতিফলন ঘটে।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মাঠে আলাদা থাকলেও জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির নতুন বোঝাপড়া ওই নির্বাচনে বেশ আলোচিত ঘটনা। বিএনপি ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেয়। বিজয়ী হয় ১৪১টিতে। আর আওয়ামী লীগ প্রার্থী দেয় মাত্র ২৬৪ আসনে। আসন পায় ৮৮টি। বাকি আসন তারা সিপিবি, ন্যাপ ও বাকশালকে ছেড়ে দেয়। বাকশাল-সিপিবি দুদলই পায় পাঁচটি করে আসন। জামায়াতে ইসলামী ২২২ আসনে প্রার্থী দিয়ে বিজয়ী হয় ১৮টিতে। আন্দোলনের তোড়ে ক্ষমতাহারা জাতীয় পার্টি আবির্ভূত হয় তৃতীয় শক্তি হিসেবে। ২৭২ আসনে প্রার্থী দিয়ে বিজয়ী হয় ৩৫টিতে। নির্বাচনের পর সরকার গঠন প্রশ্নে বিএনপি জামায়াতের সমর্থন নেয়। তবে জোট করেনি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ যাদের সমর্থন দিয়েছিল, তাদের নিয়েও কোনো ঐক্যজোট করেনি। ১৯৯৬ সালে দেশে প্রথমবারের মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন হয়। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কোনো আসন ছাড়েনি। ৩০০ আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৪৬ আসনে বিজয়ী হয়। অন্যদিকে মিত্রতা থাকলেও জাতীয় পার্টি ২৯৩ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পায় ৩২ আসন। অন্য 'মিত্ররা' কোনো আসন পায়নি। বিএনপি ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পায় ১১৬ আসন। তাদের 'মিত্র' জামায়াতে ইসলামীও ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আসন পায় ৩টি। জোটবদ্ধ নির্বাচনের ঘনঘটা হয় পরের নির্বাচনে।

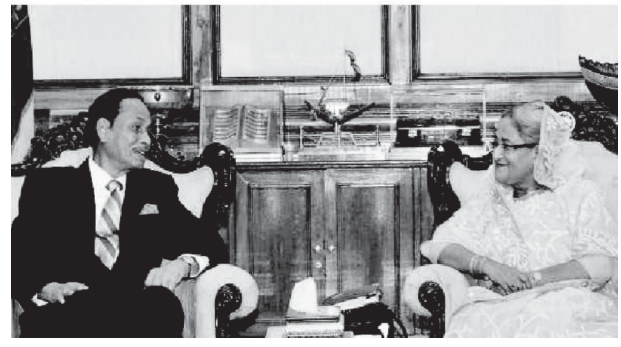

২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। বিএনপি জোটবদ্ধ নির্বাচন করে শরিক জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজোট, ও নাজিউর রহমানের জাতীয় পার্টির সঙ্গে । বিএনপি ওই নির্বাচনে ২৫২ প্রার্থী দিয়ে বিজয়ী হয় ১৯৩ আসনে। ৩১ আসনে নির্বাচন করে জামায়াত জেতে ১৭ আসনে। ইসলামী ঐক্যজোটের ৭ প্রার্থী দিয়ে জয়ী হয় দুটিতে। মঞ্জুর বিজেপি ১১ আসনে নির্বাচন করে জয় পায় চারটিতে। আর আওয়ামী লীগ সব আসনে প্রার্থী দিয়ে বিজয়ী হয় ৬২টিতে। এরশাদের জাতীয় পার্টির নেতৃত্বাধীন ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ২৮১ আসনে প্রার্থী দিয়ে বিজয়ী হয় ১৪টিতে।

২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটগাত দৃশ্যপটে আরেক ভিন্নতা। একদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট। বিএনপির চারদলীয় জোট। জোটবদ্ধ নির্বাচনে ৩৩ আসন পায় বিএনপি। এতে বিএনপির একক আসন ৩০। জামায়াত ২ এবং বিজেপি ১। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের আসন ২৩১। মহাজোটের শরিক জাতীয় পার্টি ২৬, জাসদ ৩ এবং ওয়ার্কার্স পার্টি পায় ২ আসন। জোট রাজনীতির এই চিত্রে দেশের রাজনীতিতে দুই ধারাই স্পষ্ট। একটি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে, অন্যটি বিএনপির নেতৃত্বে। বাকিদের ভরসা এই দুই দলই। জোটের শরীকানা না পেলে নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করে জয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ। আবার বড়দেরও একলা চলার পথ ছোট হয়ে আসছে। এককভাবে কোনো বড় দলের পক্ষে সংসদ বা রাষ্ট্র ক্ষমতার দুয়ার সংকীর্ণ হয়ে ওঠার লক্ষণ অনেকটাই স্পষ্ট।

এ বাস্তবতার মধ্যেই বাংলাদেশে এখন মহাজোট, ১৪ দল, ২০ দল, ঐক্যফ্রন্ট, যুক্তফ্রন্ট ইত্যাদি মোর্চার পথচলা। প্রধান

দুই দলের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যও ছোট দলের নেতারা জোট গঠনের ঘোষণা দেন। নির্বাচন সামনে রেখে দল ভাঙা, নতুন দল গড়া, জোট গঠন, পাল্টা জোট গড়া, সংলাপ, আলাপ, বিভিন্ন জায়গায় চা চক্র বা ভোজে মিলিত হওয়ার মূল রহস্য এখানেই। এসবের মধ্য দিয়ে আবারো প্রমাণিত রাজনীতিতে যেমন চিরশত্রু বা মিত্র বলতে কিছু নেই, তেমনি শেষ কথা বলেও কিছু নেই। আজ যে জোটে আছে, কাল সে নাও থাকতে পারে।

আবার নতুন করেও কোনো দল জোটে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। জোট-ফ্রন্ট, মোর্চার ইতিহাসে ৫৪-র যুক্তফ্রন্টের কথা এসেই যায়। ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে এর জন্ম। আদর্শিক মিল না থাকলেও কিছু কমন ইন্টারেস্টে গোটা পাকিস্ড়ান কাঁপিয়ে যুক্তফ্রন্ট জন্ম নেয়। এতে সম্মিলন ঘটে তখনকার বাঘা বাঘা নেতাদের। মানুষের কাছে তারা দেবতুল্য হয়ে ওঠেছিলেন। সেই ফ্রন্টও ক্ষমতার প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়।

যুক্তফ্রন্টের মিত্র হিসেবে ভূমিকা রাখে অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাশিমের খেলাফতে রব্বানী পার্টিও। এক পর্যায়ে যুক্তফ্রন্টে শরীক হয় মওলানা আতাহার আলীর নেজামে ইসলাম পার্টিও। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচি হিসেবে ১৯৫৪ সালের জানুয়ারিতে ঘোষিত ২১ দফায় প্রধানত পূর্ব বাংলার জনগণের বিভিন্ন দাবি ও অধিকার আদায়ের অঙ্গীকার করা হয়। তখন পর্যন্ত পাকিস্তানের কোনো সংবিধান ছিল না। প্রদেশের নামও 'পূর্ব পাকিস্তান' রাখা হয়নি। স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্নে ২১ দফার ১৯তম দফায় বলা হয়েছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেয়া ও সার্বভৌমিক করা হবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয়কে প্রদেশের কর্তৃত্বে আনা হবে। দেশরক্ষা বিভাগের স্থল বাহিনীর সদর দফতর হবে পশ্চিম পাকিস্তানে। আর নৌবাহিনীর সদর দফতর হবে পূর্ব বাংলায়। পূর্ব বাংলাকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য প্রদেশে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা স্থাপন করা হবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হবে।

যুক্তফ্রন্টের মূল দুই শরীক ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত প্রদেশের প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং 'শেরে বাংলা' আবুল কাশেম ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই প্রতিষ্ঠিত কৃষক-শ্রমিক পার্টি। সেখানেও শেষ পর্যন্ত কেবল আদর্শ মূখ্য থাকেনি। যার জেরে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর গঠিত যুক্তফ্রন্টে পরে হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও মাহমুদ আলীর নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রী দল এবং পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐকমত্যের ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের অঙ্গ সংগঠনে পরিণত হয়।

ঐতিহাসিক এ ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচার অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্ড়ান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী এবং পাকিস্ড়ান আওয়ামী মুসলিম লীগের আহ্বায়ক ও অবিভক্ত বাংলার সাবেক প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এই দু'জনের পাশাপাশি ছিলেন 'শেরে বাংলা' ফজলুল হক। তিনিও অবিভক্ত বাংলার সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনপ্রিয় ছিলেন। 'হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী'র নেতৃত্বেই যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অন্যদিকে ছিল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের নেতৃত্বে তৎপর ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগ। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট বিশাল ব্যবধানে বিজয়ী হয়। ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট জিতেছিল ২২৩টিতে। এরমধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৪৩, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ৪৮, নেজামে ইসলাম পার্টি ১৯ এবং গণতন্ত্রী দল ১৩টি আসন পায়। অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ৭২টি আসনের মধ্যে গণতন্ত্রী দল তিনটি এবং কমিউনিস্ট পার্টি চারটি আসন পাওয়ায় যুক্তফ্রন্টের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩০-ও। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভাগ্যে জোটে মাত্র ১০টি আসন।

কোন দল থেকে কতজনকে মন্ত্রী করা হবে- এ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এর জেরে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রথমে মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়া থেকে বিরত থাকে। তারা ছিলেন কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার

ও সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া এবং নেজামে ইসলাম পার্টির আশরাফউদ্দিন চৌধুরী। আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মন্ত্রী নেয়া হয়েছিল ১৫ মে। মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম খান, হাশিমউদ্দিন আহমদ এবং শেখ মুজিবুর রহমান। কেএসপির নেতা হলেও কফিলউদ্দিন চৌধুরীকেও আওয়ামী মুসলিম লীগের কোটা থেকে মন্ত্রী করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ছাড়া মোট ১২ জনকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। আদমজীতে সংঘটিত দাঙ্গা এবং পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করা হবে বলে কলকাতায় 'শেরে বাংলা'র কথিত ঘোষণা প্রভৃতির অজুহাতে ২৯ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বাতিল করা হয়। একই সাথে পূর্ব বাংলায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ১২-ক ধারা জারি করে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করা হয়। গভর্নর করা হয় মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে।

এর মধ্য দিয়ে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রাজনীতিরই বাস্তবায়ন ঘটে। যার পরিণতিতে প্রতিষ্ঠাকালেই পাকিস্তান থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র নির্বাসিত হয়। পঞ্চান্নর ১৭ ফেব্রুয়ারি যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দলের সভায় শেরে বাংলার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। শুরু হয় যুক্তফ্রন্টে ভাঙনের আনুষ্ঠানিকতা। তখন কলকাতায় অবস্থান করা মওলানা ভাসানি বিবৃতির মাধ্যমে ঐক্য টিকিয়ে রাখার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েও যুক্তফ্রন্ট রক্ষা করতে পারেননি।

বিজয়ের পর ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত করা শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হককে। পরদিন ৩ এপ্রিল তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নেন। ফলে ৩ এপ্রিল ফজলুল হক মাত্র তিনজনকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেন।

১৯৫৫ সালের ৬ জুন আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় গঠিত মন্ত্রিসভা 'যুক্তফ্রন্ট' নাম নিয়েই শপথ নিয়েছিল। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট সরকারই ক্ষমতায় ফিরে এসেছিল। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরিক আওয়ামী মুসলিম লীগ এতে সুযোগ পায়নি। এরই পাশাপাশি দলত্যাগ করেছিলেন আওয়ামী লীগের ৩৯ জন সদস্য, যার ফলে দলটির পরিষদ সদস্য সংখ্যা কমে হয়েছিল ১০৪।

ওদিকে গণপরিষদের ৩১টি মুসলিম আসনের নির্বাচনে 'যুক্তফ্রন্ট' পেয়েছিল ১৬টি। বড় দল হলেও আওয়ামী লীগের ভাগে এসেছিল মাত্র ১২টি আসন। পরবর্তীকালে উপনির্বাচনের মাধ্যমে একটি আসন পাওয়ায় দলটির সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ১৩। নৈরাশ্যজনক এ ঘটনাপ্রবাহ সত্ত্বেও এদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে যুক্তফ্রন্ট।

মোস্তফা কামাল
সাংবাদিক-কলামিস্ট; বার্তা সম্পাদক, বাংলাভিশন

অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবিস্মরনীয় প্রভাব

- দীয়া সিমান্ত

ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি একাধারে একই সময়ে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদ অলংকৃত করেছিলেন। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল (তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলা) জেলার এক কৃতি সন্তান, আবুল কাশেম ফজলুল হক। ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব আবুল কাশেম ফজলুল হক ছিলেন বিংশ শতাব্দির একজন বাঙালী মুসলিম আইনজীবি, আইন প্রণেতা ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ। পরবর্তীতে পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার অবদান অবিস্মরনীয়। কোলকাতা হাইকোর্ট এবং ঢাকা হাইকোর্টের স্বনামধন্য এই আইনজীবি বাংলাদেশের বাকেরগঞ্জ (বর্তমানে বরিশাল) জেলার সন্তান ফজলুল হক কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন আঞ্চলিক সিভিল সার্ভিস দিয়ে এবং রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন ১৯০৬ সালে Eastern Bengal and Assam (ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম) -এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। মি. হক ১৯১৩ সালে ঢাকা থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদে (Bengal Legislative Council) প্রথম নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২১ বছর দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৩৪ এবং ১৯৩৫ সালে ২ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মনোনীত (Central Legislative Assembly) সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে দশ দশক ধরে বঙ্গীয় আইন পরিষদের (Bengal Legislative Assembly) নির্বাচিত সদস্য হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বসহ সংসদ নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ৬ বছর যাবৎ।
এরপর আবার East Bengal Legislative Assembl, তে নির্বাচিত হয়ে ২ মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে Constituent Assembly of Pakistan এর অন্তর্ভুক্তি হয়ে ১৯৫০ এর দশকে এক বছরের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

পূর্ববাংলার তৃতীয় প্রধান মুখ্যমন্ত্রী
(৩ এপ্রিল ১৯৫৪ - ২৯ মে ১৯৫৪)
পাকিস্তানের ৫ ম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
(১১ আগস্ট ১৯৫৫ - ৯ মার্চ, ১৯৫৬)
পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় গভর্নর
(মার্চ ১৯৫৬ - ১৩ এপ্রিল ১৯৫৮)
রাজনৈতিক দল: বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, কৃষক প্রজা পার্টি
নাগরিকত্ব: ব্রিটিশ ভারতীয় (১৮৭৩-১৯৪৭)
পাকিস্তান শাসন (১৯৪৭-১৯৫৬)
পাকিস্তান (১৯৫৬-১৯৬২)
স্থান পুনরুদ্ধার: তিন নেতার সমাধি
আলমা মাদার: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

SHER-E-BANGLA WITH JINNAH

এ,কে ফজলুল হকের বর্ণাঢ্য আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ফলক:

ক্রম.	জীবন চক্র	কর্মবিবরণ ও সময়কাল
১।	শিক্ষা জীবন (১৮৭৬-১৯১৩)	* স্কুল জীবন: ১৮৯০ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ * কলেজ জীবন: ১৮৯২ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ এ পাশ। * উচ্চতর ডিগ্রি: ১৮৯৪ সালে কলকাতা প্রেসিযেন্সি কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষায় * রসায়ন, গণিত ও পদার্থ বিষয়ে ট্রিপল সম্মান অর্জন * উচ্চতর ডিগ্রী: ১৮৯৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত বিদ্যায় এমএ পাস করেন। * উচ্চতর ডিগ্রি: ১৮৯৭ সালে জনাব হক কলকাতা ল'কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন।
২।	কর্ম জীবন (১৮৯৭-১৯৫৩)	* শিক্ষকতা: ১৯০৩-১৯০৪ সময়কালে বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজে খন্ডকালীন প্রভাষক হিসাবে কাজ করেন। * সিভিল সার্ভিস: ১৯০৬ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সরকারী চাকুরিতে যোগ দেন। ১৯০৮-১৯১২ সাল পর্যন্ত কো-অপারেটিভ-এর সহকারী রেজিস্ট্রার ছিলেন। * ল' প্রাকটিস: ১৮৯৭ সালেই ল' ডিগ্রি লাভ করে বরিশাল কোর্টে কিছুদিন প্রাকটিস করেন। * কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবি: ১৯১২ সাল থেকে দীর্ঘ ৪০ বছর আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। * ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবি: ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। * আইন পেশা:১৮৯৭ সাল থেকেই আইন পেশায় মি.আশুতোষ মুখার্জীর অনুপ্রেরণায় কলকাতা হাইকোর্টে হাতেখড়ি। মাঝে ২ বছর সরকারী চাকুরিতে থাকাকালীন সময় ছাড়া জীবনের দীর্ঘ সময় এপেশায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি আইন পেশা চর্চা করেছেন যথাক্রমে কলকাতা, বরিশাল ও ঢাকায়।
৩।	রাজনৈতিক জীবন (১৯০৬-১৯৫৮)	* রাজনৈতিক দল: সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি ও যুক্তফ্রন্ট। * বাংলার প্রধানমন্ত্রী: ১৯৩৭ সালে ভারতের প্রাদেশিক নির্বাচনে তার দল বঙ্গীয় আইন পরিষদে ৩য় সংখ্যাগরিষ্ট হয়ে প্রাদেশিক সরকার গঠন করে বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকরণ। * বাংলার আইনসভার সদস্য: ১৯১৩ সালে ঢাকা বিভাগ থেকে নির্বাচিত হয়ে দীর্ঘ ২১ বছর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৪-১৯৩৬ সাল পর্যন্ত দুই বৎসর (কেন্দ্রিয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন) সময়কাল ছাড়া তিনি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন । * সর্ব ভারতীয় মুসলিমলীগ: ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভুমিকা পালন করেন। ১৯১৬ সালে সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। * ভারতের জাতীয় কংগ্রেস: ১৯১৭ সালে দলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯১৮-১৯১৯ সাল পর্যন্ত সংস্থাটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন * নিখিল ভারত মুসলিম লীগ: ১৯১৮ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দিল্লি সেশনে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন। * বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদ: ১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত মেদিনীপুরের অধিবেসনে প্রেসিডেন্ট ছিলেন। * ভাইসরয়: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হক সাহেব ভারতে প্রতিরক্ষা পরিষদের ভাইসরয়ে যোগ দেন এবং সহযোগী যুদ্ধের প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন। * ব্রিটিশ ভারত শাসনামল: ডায়ার্সি সরকার ব্যবস্থার অধীনে ১৯২৪ সালে বাংলার শিক্ষামন্ত্রী হি-সাবে শিক্ষা মনত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন।

ক্রম.	জীবন চক্র	কর্মবিবরণ ও সময়কাল
		* ভারত-ব্রিটিশ রাজনীতি: ১৯০৬ সাল থেকে ১৯৪২সাল পর্যন্ত সময়কালে মি. হক ছিলেন ব্রিটিশ-ভারত রাজনীতির এক কিংবদন্তি। * কলকাতার মেয়র: ১৯৩৫ সালে কলকাতার মেয়র পদে অলংকৃত করেন। * বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী : ১লা এপ্রিল ১৯৩৭- ২ শে মার্চ ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত অভিক্ত বাংলার প্রথম প্রধান-মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। * বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ: ১৯১৩ সালে মি. হক বাংলা প্রদেশের মুসলিম লীগের সেক্রেটারী গদে আসীন হয়ে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্বরত ছিলেন। * মুসলিম লীগ: ১৯৩৭ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং এরফলে তার মন্ত্রীসভা কার্যত মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভায় পরিণত হয়। হক সাহেবের ব্যাপক জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে বাংলাকে মুসলিম লীগের দূর্গে পরিণত করা হয়। * পাকিস্তানে মন্ত্রী: ১১ই আগস্ট ১৯৫৫- ৯ই মার্চ ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। * অবিভক্ত পাকিস্তানের মন্ত্রী: ১৯৫৫ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন। * পূর্ব পাকিস্তান মুখ্যমন্ত্রী: পূর্ব পাকিস্তানের ৩য় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ৩রা এপ্রিল ১৯৫৪- ২৯ মে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্বরত ছিলেন। * পুর্ব বাংলার গভর্ণর: মার্চ ১৯৫৬- ১৩ই এপ্রিল ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার ২য় গভর্ণর হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন। * কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠা: মি. হক ১৯৩৫ সালে ধষষ ইবহমধষ ঞবহধহঃং অংংড়পরধঃরড়হ কে কৃষক প্রজা পার্টিতে রুপান্তরিত করেন। ১৯৩৭ সালে ভারতের প্রাদেশিক নির্বাচনে তার দল কৃষক প্রজা পার্টি বঙ্গীয় আইন পরিষদে (ইবহমধষ খবমরংষধঃরাব অংংবসনষু) ৩৫টি আসন পেয়ে ৩য় সংখ্যাগরিষ্ট দল হিসাবে জয়লাভ করে। * বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান: শের-ই-বাংলা নগর. শের-ই বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শের-ই-বাংলা মিরপুর ষ্টেডিয়াম, রাজশাহী আদিনা ফজলুল হক কলেজ, ঢাকা ইডেন গার্লস কলেজ বিল্ডিং, চাখার ফজলুল হক কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্বদ্যিালয়ের ফজলুল হক হল, বুয়েটের শের-ই-বাংলা হল, বাংলা একাডেমী, বুলবুল মিউজিক একাডেমী, সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, পহেলা বৈশাখ দিবস, বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি। * ভারতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান:কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেকার হোস্টেল ও কারমাইকেল হোস্টেল, লেডি ব্রাবোমি কলেজ, মুসলিম ইনষ্টিটিউট বিল্ডিং, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেল, টাইলর হোস্টেল, মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল ইত্যাদি।
৪।	ব্যক্তি জীবন (১৮৭৩-১৯৬২)	জন্ম: ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) জেলা। পিতা: আইনজীবি মো. ওয়াজিদ মাতা: সৈয়াদুন্নেসা খাতুন ভাই: নাই বোন:নাই সহধর্মিনী: খুরশিদ বেগম, জান্নাতুন্নেসা বেগম ও মোছা. খাদেজা বেগম। পুত্র/কন্যা: এ কে রিয়াজুল হক মৃত্যু: তিনি ৮৮ বছর বয়সে ১৯৬২ সালের ২৭শে এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। সমাধি: তিন নেতার মাজার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
৫।	পত্রিকার স্বত্তাধিকার	১৯২০ সালে মি. হক, কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজাফ্ফর আহমেদ মিলে "নবযুগ" নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তবে সরকার বিরোধী নীতির কারণে এপত্রিকার জামানত বহুবার বাজেয়াপ্ত হয় এবং যার ফলে এপত্রিকা দীর্ঘদিনব্যাপি চালানো তাঁর পক্ষে চালানো সম্ভব হয়নি।
৬।	নাগরিক জীবন (নাগরিকত্ব)	ব্রিটিশ ভারতীয়: (১৮৭৩-১৯৪৭) পাকিস্তান: (১৯৪৭-১৯৫৬) পূর্ব পাকিস্তান: (১৯৫৬-১৯৬২)

এ কে ফজলুল হক ব্রিটিশ সরকার ঘোষিত নাইটহুড খেতাব প্রত্যাখান করেন। তিনি জনপ্রিয় উপাধি শের-ই-বাংলা (বাংলার বাঘ) নামে অধিক সমাদৃত ছিলেন। তিনি বিখ্যাত ছিলেন বঙ্গীয় আইন পরিষদের ভাষণের সময় ইংরেজী বক্তৃতা দেয়ার জন্য। মি. হক বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভোট পেয়ে জনসেবা করার সুযোগ কাজে লাগাতেন। প্রচলিত ভুমি ব্যবস্থাপনার সংস্কার এবং জমিদারদের প্রভাব কমানো জন্য তিনি কাজ করেছেন । রাজনৈতিক বিভিন্নতায় তিনি বামপন্থি ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের কদর করতেন। তার মন্ত্রণালয়গুলি তীব্র দলগত সংঘাতের দ্বারা চিহ্নিত ছিল।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ছিল একে ফজলুল হকের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সাফল্যের সবচেয়ে বড় অর্জন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ভারতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ খ্যাত ভাইসরয়'তে (Viceroy of India) যোগ দেন এবং সহযোগী যুদ্ধের প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন। আবুল কাসেম ফজরুল হক Quit India আন্দোলন-কালীন সময়ে তার মন্ত্রিসভা থেকে হিন্দু মহাসভা সমর্থন উঠিয়ে নিলে বাংলার গর্ভনরের চাপে ১৯৪৩ সনের ২৪শে মার্চ পদত্যাগ করেন। পাকিস্তান আমলে হক পূর্ব বাংলার এটর্নি জেনারেল হিসাবে ৫ বছর দায়িত্ব পালনসহ বাংলা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫০'র দশকে তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন এবং প্রাদেশিক গভর্ণর ছিলেন ।

জনাব হক ১৮৭৩ সালে বাকেরগঞ্জ জেলার এক মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমান বরিশাল বারের একজন খ্যাতনামা আইনজীবি মো. ওয়াজিদ এবং সৈয়াদুন্নেসা খাতুনের সন্তান। তার দাদা কাজী আকরাম আলী ছিলেন একজন মোক্তার এবং আরবি ও ফার্শী বিশারদ। তিনি ১৮৯০ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে এফ এ পরীক্ষা পাস করে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কলকাতা চলে যান। ১৮৯৪ সালে তিনি কলকাতা প্রেসিযেন্সি কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষায় রসায়ন, গণিত ও পদার্থ বিষয়ে ট্রিপল সম্মান অর্জন করেন। পরবর্তীতে গণিত বিদ্যায় এমএ পাস করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৮৯৭ সালে জনাব হক কলকাতা ল'কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯০৮ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত জনাব হক কো-অপারেটিভসের সহকারী রেজিস্ট্রার হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন। সেসময় পাবলিক সার্ভিসে অব্যহতি নিয়ে স্যার আশুতোষ মুখার্জীর পরামর্শানুযায়ী

কলকাতা হাইকোর্টের বার কাউন্সিলে যোগদান করে ল'প্রাকটিস শুরু করেন। তিনি সেপেশায় সুদীর্ঘ ৪০ বছর নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

Huq joined the All India Muslim Education Conference in Dhaka in 1906, which founded the All India Muslim League.

প্রথম বাংলা বিভাজনের পর খাজা সলিমুল্লাহ স্যারের আয়োজনে তৎকালীন পূর্ব বাংলা ও আসামের রাজধানী ঢাকায় সর্ব ভারতীয় মোহামেডান শিক্ষাবিষয়ক সম্মেলনে যোগ দেন হক সাহেব। সম্মেলনটি ছিল সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের পুনর্গঠন বিষয়ক। ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের প্রধান এজেন্ডা ছিল বাংলায় আঞ্চলিক মুসলিম লীগ বিভাজন রহিতকরণ, যেখানে মি. হক সেক্রেটারী হয়েছিলেন। স্যার সলিমুল্লাহ এবং সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯১৩ সালে ঢাকা বিভাগ থেকে বাংলার আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯১৬ সালে তিনি সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেসময় ভারতের জাতীয় বংগ্রেস এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পাদিত লখনৌ চুক্তি গঠনের পিছনে অন্যতম শক্তি হিসাবে যারা কাজ করেন তাদের একজন ছিলেন একেএম ফজলুল হক। ১৯১৭ সালে হক সাহেব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯১৮-১৯১৯ সাল পর্যন্ত সংস্থাটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। মি. হক ১৯১৮ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দিল্লি সেশনে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯১৯ সালে ১৩ই এপ্রিল অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর শহরে ইংরেজ সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ার রেগিনাল্ড ডায়ারের নির্দেশে অন্যতম কুখ্যাত গণহত্যা সংগঠিত হয় যা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে অমৃতসর হত্যাকান্ড নামে পরিচিত। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক অমৃতসর হত্যাকান্ড অনুসন্ধানী তদন্তে গঠিত পাঞ্জাব তদন্ত কমিটিতে (Punjab Enquiry Committee) মতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাসসহ অন্যান্য প্রখ্যাত নেতাদের সঙ্গে আবুল কাশেম ফজলুল হকও ছিলেন। তিনি ১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের মেদিনীপরের অধিবেসনে প্রেসিডেন্ট ছিলেন। খেলাফত আন্দোলন কালীন সময়ে মি.হক বাংলর প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী অংশের নেতৃত্ব দেন যেখানে তার প্রতিদন্দী মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী অটোম্যান সাম্রাজ্য অংশের নেতৃত্বে ছিলেন। ফজলুল হক অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরোধীতা করেন। তিনি আইন পরিষদের এবং

কলেজগুলোকে প্রত্যাহার বরার পরিবর্তে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে পছন্দ করতেন। অবশ্য পরে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে একমত না হতে পেরে কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেন। এ কে ফজলুল হক ব্রিটিশ-ভারত আমলে ডায়ার্সি সরকার ব্যবস্থার অধীনে ১৯২৪ সালে বাংলার শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে শিক্ষা মনত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৩৫ সালে ডায়ার্সি প্রশাসন প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় সাধারণ নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে যা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ সালে। হক all Bengal Tenants Association কে কৃষক প্রজা পার্টিতে রুপান্তরিত করেন। নির্বাচন প্রচারণার সময়কালে তিনি বাংলার জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসাবে আবির্ভুত হন। ১৯৩৭ সালে ভারতের প্রাদেশিক নির্বাচনে তার দল বঙ্গীয় আইন পরিষদে (Bengal Legislative Assembly) ৩৫টি আসন পেয়ে ৩য় সংখ্যাগরিষ্ট দল হিসাবে জয়লাভ করে বেঙ্গল কংগ্রেস এবং বাংলা প্রদেশ মুসলিম লীগের পরেই। বিধানসভার প্রত্যাখ্যান পন্থী ভারতীয় নীতির কারণে কংগ্রেস সরকার গঠনে অস্বীকৃতি জানায়। সেসময় হক বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এবং স্বাধীন বিধায়কদের (Bengal Provincial Muslim League) এবং independent legislator নিয়ে জোট গঠন করেন। তিনি হাউসের নেতা নির্বাচিত হন এবং বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেন।

এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার সদস্যগণ ছিলেন যথাক্রমে নলিনি রঞ্জন সরকার (অর্থ), বিজয় প্রসাদ সিংহ রয় (রাজস্ব), মহারাজা শিরিস চন্দ্র নন্দী যোগাযোগ ও কর্ম সংস্থান), প্রসন্ন সেন রায়কুট (বন), মুকন্দ বিহারী মল্লিক (সমবায়), স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন (স্বরাষ্ট্র), নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ (কৃষি ও শিল্প), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি (শ্রম ও বাণিজ্য), নবাব মোশাররফ হোসেন (আইন ও বিচার), সৈয়দ নওসের আলী (জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার)।
১৯৪০ সালে ফজলুল হক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক নির্বাচিত হন ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করার জন্য যেখানে ভারতের পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাংশ নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরীর অভিপ্রায় সন্নিবেশিত ছিল।

এ কে ফজলুল হক কর্তৃক গৃহিত স্মরণীয় কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষক ও খামারীদের দেনার দায় থেকে মুক্তি দেয়া।
তিনি Bengal Agricultural Debtors' Act (1938) প্রণয়ণের মাধ্যমে গরীব কৃষকদের সুদখোর পাওনাদারদের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি বাংলার সকল অংশে দেনা নিস্পত্তি সমিতি স্থাপন করেন। তার সময়ে প্রণীত The Money Lenders Act (1938) এবং The Bengal Tenancy (Amendment) Act (1938) গরীব চাষীদের জীবনে উন্নয়ন ঘটায়।

১৯৩৮ সালের ৫ নভেম্বর বাংলার রাজ্যসভা কর্তৃক ভুমি রাজস্ব কমিশন গঠিত হয়। ১৯৪০ সালের ২১ মার্চ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে স্যার ফ্র্যান্সিস ফ্লুয়েড কর্তৃক দেশের ভুমি পদ্ধতি সংক্রান্ত অন্যতম মূল্যবান বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ হয়। ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনটি ১৯৩৮ সালের আইন দ্বারা সংশোধিত হয় যা সকল বিধানের সঙ্গে গুরুত্বারোপ করে খাজনা স্থগিত করা হয় ১০ বছরের জন্য। এই আইন দ্বারা সব ধরনের ABWAB এবং জমিদার কর্তৃক আরোপিত রেয়াতের উপর শুল্ক রহিতকরণ হয়। রেয়াত প্রথার মাধ্যমে জমিদারগণ কোন রকম ফি ছাড়াই ভুমি স্থানান্তর করার সুযোগ পেয়েছিল। উক্ত আইন দ্বারা জমির মূল্যের উপর সুদহার ১২.৫০% থেকে কমিয়ে ৬.২৫% করা হয়। মি. হক বর্গা চাষীদের স্বার্থে বেশকিছু জনকল্যানমূলক আইন প্রণয়ন করেন তার প্রশাসনিক কার্যকালে। যদিও তিনি তার ডাল-ভাত কর্মসূচি নির্বাচনি প্রচারণার সময়ে জনস্বার্থে সম্পাদন করতে পারেননি। তিনি বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য কোটা সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন।

তিনি তার মন্ত্রীনভায় শিক্ষা ব্যবস্থাপত্র উপস্থাপন করেন। তিনি বাংলা প্রাদেশিক আইনসভায় প্রাথমিক শিক্ষা বিল পেশ করেন যেখানে আইনগতভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ফ্রি ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু বিরোধীদলীয় সদস্য এবং গণমাধ্যমের বিরোধীতার একটি ঝড় উঠলো যখন ফজলুল হক মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উত্থাপন করেন, যেহেতু এটি মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে "সাম্প্রদায়িক বিভাগের নীতি অন্তর্ভুক্ত " ছিল। একে ফজলুল হক বাংলায় কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ, লেডি ব্র্যাবর্ন কলেজ, ওয়াজিদ মেমোরিয়াল গালর্স হাই স্কুল এবং চখার কলেজসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কৃষক প্রজা পার্টির অভ্যন্তরে তীব্র দ্বন্দের কারনে মি. হক মন্ত্রি পরিষদে নিজেকে একমাত্র দলীয় সদস্য বলে পরিগণিত করেন। ১৯৩২ সালের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে, ১৯৪১ সালে ফজলুল হক এবং পাঞ্জাবের প্রধনমন্ত্রী স্যার সিকান্দার হায়াত খান ভাইসরয়ের প্রতিরক্ষা পরিষদে যোগ দেন। তবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এতে বিরক্ত হন এই মনে করে যে, ভারত বিভাগের বিরোধীতাকারী ছিল এই কাউন্সিল এবং অন্তর্গত সদস্যগণ। ফলস্বরুপ মুসলিম লীগ বাংলায় হক সরকারের পক্ষে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। জিন্নাহ'র রিটের বিপরীতে হক মুসলিম লীগ থেকে ২রা ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন। এবং নতুন করে কোয়ালিশন গঠনের মধ্য দিয়ে ১৯৪১ সালের ১২ই ডিসেম্বর একে ফজলুল হকের নেতুত্বে দ্বিতীয় জোট সরকার গঠিত হয় । মুসলিম লীগ ছাড়া বঙ্গীয় আইন পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই জোটের সমর্থক ছিলেন। সমর্থকরা শামসুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি, সুভাষচন্দ্র বসু, বঙ্গীয় কংগ্রেসের সমর্থক বসু সদস্য এবং শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিন্দু মাহসাবের প্রতিষ্ঠাতা ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষ দল অন্তর্ভুক্ত। খাজা হাবিবুল্লাহ, খান

বাহাদুর আব্দুল করিম, খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, শামসুদ্দীন আহমেদ, শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ কুমার বোস ও উপেন্দ্রনাথ বর্মন দ্বারা মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছিল।

১৯৪৩ সালের ২৪ মার্চ মি. হক গদত্যাগ করেন এবং গভর্ণরের শাসন জারি হয়। হকের বেশীরভাগ আইনসভার সদস্যের আস্থা থাকা সত্ত্বেও তিনি বাংলার গভর্ণর জন হাবার্টের সঙ্গে তীব্র সম্পর্ক গড়ে তোলেন। গভর্ণর প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতা ও পৃষ্টপোষকসহ বিরোধীজোটের স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন এবং আইনসভার কলিকাতা ট্রিও'র মির্জা আহামেদ ইস্পাহানী, কে নূরুদ্দিন ও এ আর সিদ্দিকীকে সমর্থন করতেন। হক সাহেবের বিরুদ্ধে লীগের প্রচারণার ফোকাল পয়েন্ট ছিল যে, তিনি মুখার্জীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছেন যিনি কিনা মুসলমানদের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। হকের মন্ত্রণালয় বাতিল করতে লীগ কমিটি গভর্ণরের কাছে আবেদন জানায়।

মি. হক ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি ও মাওলানা ভাসানীসহ যুক্তফ্রন্টের (ইষ্ট পাকিস্তান) জোটের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার আইন পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করে। মি. হক নিজেই তার নিজ এলাকা পটুয়াখালীতে চুড়ান্ত প্রতিদ্বন্দী স্যার খাজা নাজিমুদ্দীনকে পরাজিত করেন। হক প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন দু'মাসের জন্য। তার সেই সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে তিনি বাংলা একাডেমি প্রতিষ্টার ব্যবস্থা করেন। সৌদি আরবের রাজা সৌদকে করাচিতে রাজকীয় সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মি. হককে আনতে ঢাকায় একটি বিমান পাঠিয়েছিলেন। নিউইর্য়ক টাইমসের একটি রিপোর্টে বলা হয় মি. হক পূর্ব বাংলার জন্য স্বাধীনতা চান, যা তার বরখাস্ত এবং গভর্ণর জেনারেলের শাসন জারি করে। পরে হককে গৃহবন্দি করে রাখা হয়।

১৯৫৫ সালের আগস্টে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগের মধ্যে একটি জোট তৈরী হয় চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী ও এ কে ফজলুল হককে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করার প্রত্যয় নিয়ে। পরে রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী আলী বরখাস্ত হন, যিনি আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান দলের জোট সরকার গঠনে অনুমতি দিয়েছিলেন। ফলে কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং মুসলিম লীগ প্রধান বিরোধীদলে পরিনত হয়। একে ফজলুল হক ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালের ১লা জুলাই পাকিস্তানী অভ্যুত্থান পর্যন্ত দুই বছর দায়িত্ব পালন করেন। অভ্যুত্থানের পর মি. হককে আবারো গৃহবন্দি করা হয়।

ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া বিভক্তির পর হক সাহেব ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং পূর্ব বাংলার এডভোকেট জেনারেল পদে উন্নীত হন। এই পদে তিনি ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত দায়িত্বরত ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর একটি সাহিত্য সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানের ভাষন প্রদানকালে মি. হক বাংলা ভাষার জন্য ভাষা একাডেমির প্রস্তাব দেন। তিনি ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করেন। বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থাকালে জনাব হক আহত হন। ১৯৫৫ সালের আগস্টে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগের মধ্যে একটি জোট তৈরী হয় চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী ও এ কে ফজলুল হককে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করার প্রত্যয় নিয়ে।

পরে রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী আলী বরখাস্ত হন, যিনি আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান দলের জোট সরকার গঠনে অনুমতি দিয়েছিলেন। ফলে কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং মুসলিম লীগ প্রধান বিরোধীদলে পরিনত হয। একে ফজলুল হক ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালের ১লা জুলাই পাকিস্তানী অভ্যুত্থান পর্যন্ত দুই বছর দায়িত্ব পালন করেন। অভ্যুত্থানের পর মি. হককে আবারো গৃহবন্দি করা হয়। উল্লেখ্য সেসময় নিউইর্য়ক টাইমসের একটি রিপোর্টে বলা হয় যে মি. হক পূর্ববাংলার জন্য স্বাধীনতা চান, যা তার বরখাস্ত এবং গভর্নরের শাসন জারি করে। একে ফজলুল হক নিজের সম্পর্কে উক্তি করেন এভাবে"আমি গত ৬০ বছরের বঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের জীবন্ত ইতিহাস। আমি নি:স্বার্থ এবং সাহসী মুসলিমদের সেই ব্যান্ডের শেষ জীবিত যারা ভয়ংকার অদ্ভুদ লড়াইয়ের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে লড়াই করে"। বাস্তবিকই বাংলার রাজনীতিতে তার ভুমিকা (বিশেষ করে বাংলাদেশ) কিংবদন্তি। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব নিয়ে অধিবেশনে প্রবেশের সময় মুসলিম লীগের হিন্দু মুসলিমগণ বাংলার বাঘ আবুল কাশেম ফজলুল হককে পথ করে দেবার সময় মি. হক সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উক্তি করেন "যখন বাঘ আসে, তখন মেষ শাবক অবশ্যই দিতে হবে"।

তথ্যসূত্র:

1. Gandhi, Rajmohan (1986). Eight Lives. SUNY Press. pp. 189–190. ISBN 0-88706-196-6.

2. "Huq, AK Fazlul - Banglapedia". En.ban-

glapedia.org. Retrieved 2017-08-05.

3. Dharitri Bhattacharjee (2012-04-13). "It's Time Bengal Remembered a Certain Huq - The Wire". Thewire.in. Retrieved 2017-08-05.

4. Rachel Fell McDermott; Leonard A. Gordon; Ainslie T. Embree (15 April 2014). Sources of Indian Traditions: Modern India, Pakistan, and Bangladesh. Columbia University Press. p. 836. ISBN 978-0-231-51092-9.

5. "Huq, AK Fazlul - Banglapedia". En.banglapedia.org. Retrieved 2017-08-10.

6. "From Plassey to Partition: A History of Modern India - Sekhara Bandyopadhyaya - Google Books". Books.google.com.bd. Retrieved 2017-08-05.

7. http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Academy

8. "Sher-e-Bangla: only leader concurrently President of All India Muslim League and the General Secretary of All India National Congress". Soc.culture.bangladesh.narkive.com. 2006-05-02. Retrieved 2017-08-10.

9. Hafez Ahmed at http://www.thefinancialexpress-bd.com. "Mohan Mia, the forgotten child of history". Print.thefinancialexpress-bd.com. Archived from the original on 5 August 2017. Retrieved 21 July 2017.

10. Salahuddin Ahmed (2004). Bangladesh: Past and Present. APH Publishing. p. 147. ISBN 978-81-7648-469-5.

11. AK Fazlul Huq Jr (2014-04-26). "Sher-e-Bangla: The Tiger of Bengal". Dhaka Tribune. Retrieved 2017-08-10.

12. Syed Ashraf Ali. "Sher-e-Bangla: A natural leader". The Daily Star. Retrieved 2017-08-10.

13. "The Financialexpress-bd". Print.thefinancialexpress-bd.com. Retrieved 2017-08-10.

14. "Sher-e-Bangla: The Tiger of Bengal | Dhaka Tribune". Archive.dhakatribune.com. Retrieved 2017-08-10.

15. Gandhi, Rajmohan (1986). Eight lives : a study of the Hindu-Muslim encounter. Albany, N.Y.: State University of New York Press. ISBN 9780887061967.

16. "Great Politicians". Sher-e-Bangla AK Fazlul Huq (Krisak Proja Party). Muktadhara. 9 May 2001. p. 67. Archived from the original on 8 September 2007. Retrieved 14 September 2007.

17. On the 49th death anniversary of the man who moved the resolution that eventually resulted in the creation of Pakistan, there is barely a mention of him in the media. Some years ago the name of the road was misspelt as Fazle Haq Road, and it has been changed to A K M Fazlul Haq. What the letter "M" stands for remains a mystery. In memory of Fazlul Haq

18. http://en.banglapedia.org/index.php?title=Muslim_League

Jawaharlal Nehru was Huq's political secretary between 1918 and 1919

The Working Committee of the Lahore Resolution in 1940. Prime Minister Huq is standing beside M. A. Jinnah (third from left on the bottom row)

Sher-e-Bangla Nagar, which houses the Parliament of Bangladesh, is named in honour of Huq

Huq called for the creation of the Bangla Academy in 1948

The old high court of East Bengal. Huq was Advocate General of East Bengal from 1947 to 1952.

Huq's short lived cabinet in East Bengal, which included Sheikh Mujibur Rahman (standing beside Huq; 2nd from left on bottom row)

নূরজাহান বেগম মুক্তার একান্ত সাক্ষাৎকার

নাজনীন নাহার

ছোটবেলা হতে রাজনৈতিক পরিমন্ডলে বেড়ে উঠেছেন বর্তমান সাংসদ নূরজাহান মুক্তা। সংরক্ষিত নারী আসনে সাংসদ তিনি। বাবাও ছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তৃণ পর্যায় হতে রাজনৈতিক চর্চা। নিরঅলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন নিজ এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে। দেশে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তার নিজ আদর্শ মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা। অঙ্গীকারবদ্ধ নিজের সাথে নারীর আত্মিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়নে আমৃত্যু কাজ করবার সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকলেও বা না থাকলেও দেশের সংসদ এবং সাংসদ বিষয় সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন "পার্লামেন্ট ফেইস" সম্প্রতি মুখোমুখি হয়েছিল এই তৃণমূল নেতার। রাজনৈতিক পারিবারিকসহ দেশ নিয়েও আগামীর পরিকল্পনা নিয়ে কথা হয় নেতার সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নির্বাচিত অংশটুকু লিপিবদ্ধ করা হলো–

প্রশ্ন: কার উৎসাহে রাজনীতিতে এসেছেন ?

উ: নি:সন্দেহে বাবা তবে এর নেপথ্যে ছিল মা । আমি দেখেছি আমার মা কিভাবে আমার বাবা কে সহযোগিতা করতেন । আমার বাবা মারা গেছেন অনেক আগে, ৯২ তে এর পর মা'ই আমার রাজনীতিতে উৎসাহ দিতেন । বলতে গেলে বাবার অনুপ্রেরনা আর মার উৎসাহে রাজনীতিতে এসেছি।

প্রশ্ন: বাবার জায়গাটায় কতটুকু পৌঁছাতে পেরেছেন বলে মনে করেন?

উ: বাবা তো পুরো এমপি ছিলেন। বাবা মানুষকে অনেক সহযোগিতা করতেন । আমিও চেষ্টা করি মানুষকে সহযোগিতা করতে। তবে একটা কথা আছে সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই । তবে মানুষকে সাহায্যে করলে আত্মার তৃপ্তি পাই ।

প্রশ্ন: আপনি একজন জনপ্রতিনিধি । তৃনমুল মানুষের যে প্রত্যাশা বা স্বপ্ন তা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিতে কাজ করছেন তার কতটুকু অর্জন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন ?

উ: রাজনৈতিক পরিবারে আমার জন্ম। ছোট বেলা থেকে রাজনৈতিক পরিবেশে বড় হয়েছি। আমার বাবা সাবেক এমপি ছিলেন আবু জাফর মো মইনুদ্দিন। আমার চিন্তা ভাবনা আমার অস্থিমজ্জা ধ্যান-জ্ঞানে রাজনীতি। আমি দেখতাম কিভাবে বাবা মানুষের সেবা করে। ছোট বেলা থেকেই সেটা দেখে দেখে বড় হয়েছি। সাভাবিক ভাবে এটা আমার মাঝে প্রতিফলিত হয়েছে। স্থানীয় বলেন বা তৃনমুল বলেন যখন রাজনীতি করেছি তখন তাদের কে নিয়েই করেছি । আমার বাবা তৃনমূল কে অসম্ভব পছন্দ করতেন । আমার বাবা বলতেন তৃনমুল হচ্ছে আমার আসল

ঠিকানা । আমার বাবা অসম্ভব জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। আমি যখন পুরোপুরি রাজনীতিতে আসি তখন আমার বাবার মত তৃণমূলকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। যখন তৃণমূলে যেতাম তাদের সাথে কাজ করতাম তখন দেখতাম সাধারন মানুষের চাওয়া পাওয়া টা কি? জনগন কি চায়? সেটা তখন তেকেই আমি অনুধাবন করেছি। তৃণমূল রাজনীতি থেকে এসেছি বলেই এটা আমার জীবনে একটা অভিজ্ঞতা । আর এ অভিজ্ঞতা এমপি হওয়ার পর ভীষণ ভাবে কাজে লেগেছে। আমি এমপি হওয়ার পর প্রথমে এমন কিছু কাজে হাত দিয়েছি যার দরকার আমি হাতে কলমে দেখেছি, যেগুলো আগে করা দরকার। যেমন গ্রামের রাস্তা-ঘাট, চিকিৎসা ব্যবস্থা , বিদ্যালয় বা উচ্চ-বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ সুবিধা, অসহায় বৃদ্ধ মহিলা বা স্বামী পরিত্যক্ত নারী বা বয়স্ক বৃদ্ধ ব্যাক্তি যারা আর্থিক টানা-পোড়ানে বা আর্থিক অভাবে চিকিৎসা নিতে পারে না তা দুর করা । নারীদের সাবলম্বী করা ও যুবকদের বেকার সমস্যা দুর করা । সাভাবিক ভাবে ঘুরে ফিরে এগুলোই থাকে মনুষের চাহিদা তা আমি তখন ে থেকেই অনুধাবন করতে পেরেছি। যার ফলশ্রুতিতে এমপি হওয়ার পর সেগুলো করতে পেরেছি।

প্রশ্ন: আপনি যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে কাজ করেছেন যা এক-দিকে ক্যারিয়ারের জন্য মাইলফলক আবার চ্যালেন্এঞ্জিং ও বটে। এই কাজ করার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল?

উ: আমি তখন সুপ্রিমকোর্টের সহকারী এ্যাটনী জেনারেল ছিলাম। যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে কাজ করা আমার জীবনের সবচেয়ে স্বরনীয় বিশেষ ঘটনা। আমার বাবা একজন মুক্তিযে-াদ্ধা ছিলেন। এদেশ জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন হয়েছে। এদেশ স্বাধীন হতে গিয়ে ৩০ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছেন , ২ লক্ষ মা- বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। আরো অনেকের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ এ বাংলাদেশ। আমারদের ইলেকশন ম্যানুফ্যাকচারিতে ছিল যুদ্ধপরাদীদের বিচার । দলক্ষমতায় আসার পর একটি আইনজীবীদের টিম তৈরি করা হয় সে টিমে আমাকেও নেয়া হল। ট্রাইবুনালে যারা বড় বড় যুদ্ধাপরাধী ছিলেন যেমন কাদের মোল্লা, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, কামরুজ্জামান, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এদের যখন বিচার চলছে তখন ট্রাইব্যুনালে যারা সাক্ষী দিতে এসেছে তাদের আত্মচিৎকার। তাদের স্বজন হারানো বেদনা অনেকে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছেন। অনেকে সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। যারা ধর্ষিত হয়েছেন ট্রাইব্যুনালে প্রথম আমি তাদের উপস্থাপন করি। সোহাগপুরে কামরুজ্জামান যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে সোহাগপুর বিধবা পল্লি থেকে তিন বিধবাকে আমি সাক্ষ করাই । তাদের জবান বন্দী করাই প্রসিকিউশনের পক্ষে। কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে আমি মোমেনা কে সাক্ষ করাই। তখন ট্রাইব্যুনালে আমি একমাত্র মহিলা প্রসিকিউশন ছিলাম। সে এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। আমাকে অনেকে বলেছে এ ট্রাইব্যুনালে কাজ করবা এতো সাহস কেন তোমার। তখন আমি বলেছি কাউকে না কাউকে তো এ কাজ করতে হবে আর আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। আমি তৃপ্ত, আমাদের সরকার বিচারের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা রেখেছে। আমি যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে কাজ করতে পেরে গর্বীত।

প্রশ্ন: একজন রাজনীতিবীদ ও একজন আইনজীবী এ দুই পেশায় কোনটিতে বেশি সাচ্ছন্দবোধ করেন?

উ: বাংলাদেশে অনেক পেশা আছে এর মধ্যে যারা আইন পেশায় আছে আমার মনে হয় তারাই বেশি রাজনীতিতে আসে । এ দুই পেশার মধ্যে সুক্ষ গভীর একটা সম্পর্ক আছে। আমি দুটোতেই এনজয় করি আমার মনে হয় একটি আরেক-টির পরিপূরক। আমি আইন পেশায় ও মানুষের সেবা করি। একজন রাজনীতিবীদ হিসেবেও মানুষের সেবা করি। তবে চুল চেরা বিশ্লেষন করলে আমি রাজনীতিকে বেশি আপন মনে হয়।

প্রশ্ন: একজন নারী হিসেবে এতো ব্যস্ততার মাঝেও পরিবারকে কি ভাবে সামাল দিচ্ছেন?

উ: আমি যে ভাবে আমার রাজনীতি বা আইন পেশায় সময় দিয়েছি তেমনি ভাবে আমার পরিবার আমার সন্তানদেরও সময় দিয়েছি। আমার কাছে মনে হয়েছে সবগুলোই সামলাতে হবে । কোনটার কাছে হারলে চলবে না। আমার চিন্তায় ছিল একটা করতে গিয়ে যেন আরেকটা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এর ফলে আমাকে অনেক

লোড নিতে হয়েছে। আমার নিজের উপরেই নিজের চাপ ছিল। কাউকে অবহেলা করা যাবে না আমার স্বামী-সন্তানদের আমার প্রতি অধিকার আছে পূর্ন সেবা পাওয়ার । আমার প্রতি তাদের অনেক অবদান আছে। যেহেতু আমি রাজনীতি করি চাইলেও আমি তাদের পরিপূর্ন সময় দিতে পারি নাই। সেক্ষেত্রে তারা আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছে। আমার চিন্তায় সব সময় থাকতো আমার পরিবারের পাশে থাকা।

প্রশ্ন: আপনার দৃষ্টি কোন থেকে নারীর ক্ষমতায়নে কতটুকু উন্নত হয়েছে?

উ: অনেক বেশি উন্নত হয়েছে। এটা একটা রেডিকাল চেঞ্জ আমি বলব। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী উন্নয়নে সারা পৃথিবীতে রোল মডেল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী অসংখ্য পুরোস্কার পেয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা যখনই ক্ষমতায় ছিলেন তখনই নারীদের উন্নয়ন হয়েছে। ট্রেন চালক থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ পদ সরকার প্রধান এখন নারী ।

আমাদের স্পীকার, আমাদের ডেপুটি লিডার সাজেদা চৌধুরি একজন নারী । বর্তমানে পাইলট, পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে প্রতিটি পদে মেয়েদের অবস্থান। এমন কি এভারেষ্ট জয় করেছেন এখন নারী। বর্তমানে কেউ বলতে পারে না নারী এটা করতে পারেনা ওটা করতে পারে না। আমদের স্পীকারের যোগ্যতা, দক্ষতা দেখে আমার গর্ববোধ করি । এবং আগের থেকে বর্তমানে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যাও বেড়েছে।

প্রশ্ন: আগামী নির্বাচনে সর্ব দলীয় অংশ গ্রহন টা কেমন হবে বলে মনে করেন?

উ: গত ২০১৪ নির্বাচনে যে একটি দল অংশ গ্রহন করেন নাই । তারা অংশ গ্রহন না করে বুঝতে পেরেছে তারা ভুল করেছে। তবে আগামী নির্বাচনে একটি দলও নেই যে অংশ গ্রহন করবে না। যদিও এখন অনেকে বলতে চাচ্ছে এটা লাগবে ঐটা লাগবে, এ শর্ত ঐ শর্ত, এটা বলার জন্য বলা । নির্বাচনে না গেলে সে দলের সংসদে কোন প্রতিনিধিত্ব থাকে না। আর সংসদে কোন দলের প্রতিনিধিত্ব না থাকলে জনগনের কাছে সে দলের কোন অস্থিত্ব থাকে না। দল আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়। গতবার যারা নির্বাচনে যায় নি তারা যদি এবার নির্বাচনে না যায় তাহলে পর পর দুই বার হয়ে যায়। জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ অনুযায়ী পর পর দুই বার নির্বাচনে অংশ গ্রহন না করলে তার নিবন্ধন বাতিল হয়ে যায়। নির্বাচন মানে একটা উৎসব মুখর পরিবেশ আর এ সুযোগ কেউ হাত ছাড়া করতে চায় না। আর আমারা চাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা হোক এবং জনগন যাকে রায় দিবে তারাই সরকার গঠন করুক। আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর একই কথা।

প্রশ্ন : নারী নেতৃত্বর উত্থান কি ভাবে হতে পারে বলে মনে করেন?

উ: আমি যখন রাজনীতিতে এসছি তখন আমাদের যারা ছিল তারা সহযোগিতা করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগিতা পেয়েছি কোন ক্ষেত্রে পাই নাই । রাজনীতিতে নারীদের উত্থান এতো সোজা কথা নয়। নারীদের সুযোগ কি পুরুষেরা দিবে? দিবে না । তারা ভাবে নারী কি রাজনীতি করবে । নারী পারবে না। যতই যোগ্য হোক দক্ষ হোক তাদের দক্ষতা কি পুরুষ মানতে চায়? চায় না। এ প্রতিকুল অবস্থা পেরিয়ে আজ আমরা এ জায়গায় এসে পৌছেছি। রাজনীতি যে যেখানেই থাকুক তার হতাশ হলে চলবে না । সে অনুকুল পরিবেশ নাও পেতে

পারে। হতাশ না হয়ে লেগে থাকতে হবে। তাহলে একদিন না একদিন তার উত্থান হবেই।

প্রশ্ন: নিজেকে বাঙ্গালী না বাংলাদেশী কোন পরিচয় দিতে বেধি স্বাচ্ছন্দবোধ করেন?

উ: আসলে আমারা অরজিন বাঙ্গালী। আর নাগরিকত্ব হিসেবে বাংলাদেশী।

প্রশ্ন : নারী উন্নয়নে বাধা আপনি কি বলে মনে করেন?

উ: আমি মনে করি নারী উন্নয়নের প্রধান বাধা হচ্ছে শিক্ষা , যতক্ষন নারী পুরোপুরি শিক্ষিত হতে না পারবে ততক্ষন তারা বাধা অতিক্রম করতে পারবে না । এরপর হচ্ছে কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোড়ামী। আরেকটি হচ্ছে দারিদ্রতা। দারিদ্রতা পেরিয়ে সামনের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন: নারী উন্নয়নে বাধা এমন কি দোষ আপনি নারীদের দেখতে পান?

আমাদের পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে টিকে থাকতে হলে নারীদের এক থাকতে হবে । পুরুষ তান্ত্রিক সামাজে নারীদের অহিংস লড়াই করে টিকে থাকতে হবে । নারীরা অনেক ক্ষেত্রে দ্বিধা বিভক্ত। তাদের মধ্যে ঐক্য কম।

প্রশ্ন: সরকারের সকল কর্ম কান্ড জনহিতকর এটা কতটা বিশ্বাস করেন?

উ: এ সরকার জনগনকে নিয়েই ভাবে জনগন কিভাবে ভালো থাকবে। কিভাবে জনগনের কল্যান হবে। দেশে দারিদ্রতা দুর করে কি ভাবে উন্নত জীবন যাপন করবে এ লক্ষ নিয়ে কাজ করছে সরকার। ২০২১ সনের মধ্যে এদেশে মধ্যেম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে। দেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য আজ প্রধানমন্ত্রী জীবনের ঝুকি নিয়ে কাজ করেছে। তাকে অনেক বার মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সে বসে নেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে বাস্তবে রুপ দেবার জন্য প্রান পনে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ক্ষমতায় না আসতে পারলে সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন তাতে কতটুকু সক্রিয় থাকবেন?

উ: প্রতিটা সরকারের কিছু নিয়ম মাফিক পরিকল্পনা থাকে। তারা সে মাফিক কাজ করে। যেমন আমাদের ২০২১ সন নাগাদ এই দেশকে মধ্যে আয়ের দেশ হিসেবে রুপান্তরিত করা ।

এবং এছাড়া আমাদের কিছু অগ্রাধিকার মুলক পরিকল্পনা আছে। সে গুলো আমারা আামাদের মতো করে সাজিয়েছি । অন্য কেউ ক্ষমতায় আসলে তারা প্রকল্পগুলো রাখবে কিনা? এটা হচ্ছে বড় কথা । ইতি পূর্বে দেখা গিয়েছে যখন আমারা ক্ষমতায় আসতে পারি নাই তখন তারা আমাদের সকল প্রকল্প বন্ধ করে দিয়েছে। আমারা বিরোধী দলে থাকলেও সোনার বাংলা গড়ার জন্য কাজ করে যাবো।

প্র: আগামী ৫ বছর পর আজকের যে মুক্তা তাকে কোথায় দেখতে চান?

উ: মানুষের স্বপ্ন থাকে আকাশ ছোয়ার। তবে খেয়াল রাখবো আকাশ ছুতে গিয়ে যেন পা মাটি থেকে না উঠে যায়।আমি যেন আমার অস্তিত্ব কে ভুলে না যাই । আমি মানুষের সেবা করছি সামনেও যেন মানুষের সেবা করে যেতে পারি। পদ থাক বা না থাক মানুষের সেবা করে যেতে চাই। পদ থাকলে সেবা করতে সুবিধা হয় । আবার অনেকে পদে থেকেও মানুষের সেবা করে না । আমি কাজ করে যেতে চাই বাকিটা আল্লাহ জানে।

প্রশ্ন: একজন জনপ্রতিনিধির কতটুকু গ্রহনযোগ্যতা থাকতে হয় বলে মনে করেন।

উ: একজন জনপ্রতিনিধি হতে গেলে তার অবশ্যই সাধারন মানুষের কাছে গ্রহন যোগ্যতা থাকতে হবে । তার মানুষের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। তার দেশ গড়ার যোগ্যতা, দক্ষতা থাকতে হবে । সে যদি খুব উচ্চ শিক্ষিত নাও হয় তার মিনিমাম একটা শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। তার ভিতরে সততা থাকতে হবে এবং তার পরিশ্রমি হতে হবে।

বীরবিক্রম শাহজাহান সিদ্দিকীর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ

দীয়া সিমান্ত ও নাজনীন নাহার

(সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পর্ব)

প্রঃ স্বাধীকার আন্দোলন যুদ্ধে কোন সেক্টরের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন?

উঃ আমি ১৯৭১ সালে যখন অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিলাম তার পরেই তো মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো তো মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকেই আমি আপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের গ্রামের কিছু ছেলেকে নিয়ে আমরা ত্রিপুরা রাজ্য যেটা আগরতলা বলে সেখানে চলে গেলাম তো ওখান থেকেই এক পর্যায় আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো শালবন বিহার নামে একটি জায়গায় ওখ-ানে যেয়ে দেখলাম যে ওখানে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ওখানে আছে তারা সামরিক যত অস্ত্রশস্ত্র এগুলি নিয়ে আছেন এবং তারা মাঝেমাঝে বর্ডারে যেয়ে পাক সেনাবাহিনির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। বিশেষ করে মটার শেল নিক্ষেপ করা হয় তো আমরা গেলাম একদিন বিকেলে তো ওখানে তো শোয়ার ব্যবস্থা কিছুই নাই ইট জোগাড় করে কোনোমতে আমরা শুয়ে থাকলাম। আমাদের কিছু খিছুরি জাতিয় খাবার দেয়া হল । পররের দিন বলা হল তোমাদের একটা ট্রেনিং দেয়া হবে । কি ট্রেনিং ? গ্রেনেট ট্রেনিং।

প্রঃ কে বললেন এটা?

উঃ এটা বললেন তখনকার দিনের মেজর সাকায়াত জামিল পরে মেজর জেনারেল হয়েছেন শওকত আলি তারা ২/১ জনের কথা আমার মনে আছে। উনারা বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ছিলেন তারা বললেন যে আমরা যে বাঙালী গেলাম তোমাদেরকে গ্রেনেদের প্রশিক্ষণ দেবে। গ্রেনেট কি জী-বনে দেখি নাই যে ওই যে গোবর রাখার জন্য গ্রামগঞ্জে রাখা হয় আপনারা দেখেছেন কিনা- একটা পিট করা হয় গর্ত । এরকম একটা মাটির গর্ত বেশ বরসর গর্তের চারিদিকে আমরা দাড়াঁলাম আমাদেরকে বলা হল যে, কামরাঙ্গের মত, এখন তো গ্রেনেট সবাই চিনে, এটা হল এই ঐঊ ৩৬ যরহফ এৎবহধফব ঐঊ মানে হল ঐরময ঊীপষঁংরাব ৩৬ মানে এটা যদি এ্ওযৎড়া হিয় এটা যখন নঁৎংঃ হবে তখন ৩৬ টা স্প্লিনট-ার হবে এবং এটার আঘাতে মানুষ মারা যাবে তো এইটা মারা শিখানোর জন্য অল্প কিছুক্ষণের ট্রেনিং ঘণ্টাখানেকের। এইটা মারতে হলে হাত সোজা রাখতে হবে এরকম মারতে হবে মেরে লাইন পজিশনে চলে যেতে হবে যাতে স্প্লিনট-ার তোমার গায়ে না লাগে তো ওটা যেহেতু গর্ত, গর্তের মধ্য পড়েছে । আমাদের প্রশিক্ষণ এইগুলো। এরপর বলে প্রশিক্ষণ শেষ । আজকে রাতেই তোমরা বাংলাদেশের ভিতর চলে যাবে। বাংলাদেশের ভিতরে গিয়ে টার্গেট কিছু না

সুনির্দিষ্ট কিছু না যেয়ে তোমরা ওখানে এই গ্রেনেট দিয়ে যুদ্ধ করবা। আর গ্রেনেট দিয়ে কি যুদ্ধ করবো কিছুই বুঝি নাই, বুঝলাম যে ওগুলো দেখলে বাংলাদেশের মানুষ তো হতভম্ব হয়ে যাবে। এপ্রিল ও মে মাস। তো মানুষকে একটু চাঙ্গা করার জন্য তো একদিন আমি যেতে যেতে আমার গ্রামের বাড়ি চলে গেলাম গ্রামের বাড়ি গিয়ে থাকতে লাগলাম ,যে কি করা যায় তো কি করা যায় এমন ভাবনার এক পর্যায়ে আমার বাবার মামাতো ভাই আব্দুল হক চাচা, আমরা একই বয়সী। সে ছিল সাহসী। বল্ল চল একটা কাজ করি । বল্লাম কি? বল্লেন তুই যে যুদ্ধের একটা অস্ত্র এনেছিস সেটা মারবো । ওনাদের পুকুরের পারে গেলাম তো পুকুর পারে যেতে বাধেঁর মতো একটা আছে ওইটার আড়ালে গেলাম। গ্রেনেট কি-ভাবে খুলতে হয় এটাতো জানি ,তখন এটা খুলে সেইফটিপিন আছে এটা মুখের মধ্যে কামড় দিয়ে রাখতে হয় আর লিভারটা হাত দিয়ে ধরে রাখতে হয়। ধাম করে মেরে দিলাম। মেরেছি পাট ক্ষেতে। বিকট আওয়াজ।

পরের দিন দেখেছি পাটক্ষেত সহ পুড়েটুড়ে গেছে মাটি তো যখন বাড়িতে আসছি আমার আব্বার বড় ভাই আমার জ্যাঠা হাজী মমতাজুদ্দিন বলছিল গ্রাম্য ভাষায় "ভাতিজারে শোন- কিজানি একটা রোজ কেয়ামতের মত আওয়াজ হইল কি হইছে কি হইছে? আমি বললাম জ্যাঠা কিছুনা মুক্তিযুদ্ব হইছে ওই মুক্তিযুদ্ব হচ্ছে মানুষের মনবল ফিরেয়ে আনার জন্য আমাদের গ্রেনেট অপারেশন । আর আমি আরেকটা চেষ্ঠা করেছিলাম। শুনতে পেলাম ইব্রাহিমপুর নামের একটা গ্রামে পেরা মিয়া চেয়ারম্যান সে মুক্তিযুদ্ধে যারা যেতে চায় তাদেরকে ধরিয়ে দেয় পাকবাহি-নীদের হাতে। চাঁদনী রাতছিল ওকে মারার জন্য তার বাড়িতে গিয়াছিলাম গ্রেনেট নিয়ে। কিন্তু গ্রেনেট যখন আমি পিন খুলে ফেলেছি এবং মারব তখন হঠাৎ করে দেখি বাড়ী নেটিং করা আর নেটিং করা হলে তো ওই গ্রেনেট ওখানে যেয়ে নেটের মধ্যে মানে জালে লেগে আবার ফেরত আমাদের দিকেই আসতো এবং আমি উড়ে যেতাম। তো ওটা আর হয়নাই। পরে আবার ফিরে গেলাম আগরতলা।

আগরতলা থেকে আমাকে কিছুদিন মহসিনগড় ক্যাম্পে রাখা হল। ইয়থক্যাম্পে তখন হাজারে হাজারে দলে দলে যুবক ছেলে মেয়েরা যুদ্বে যাওয়ার জন্য ক্যাম্পে যায়। এটার নাম হল ইয়থ ক্যাম্প । মহসিনগড় ইয়থ ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন দেওয়ান আবুল আব্বাস এম এন এ। তা আমি ওখানে ছি-লাম অখান থেকে কিছু কাজ করতাম। সকালে পিটি, প্যারেট যেহেতু আমি মিলিটারী সাইন্স পাশ, আমি জানিনা ওগুলো। আমি শিখাতাম । আমাকে আবার নিয়ে যাওয়া হলো আরেক

জায়গায় সেই জায়গার নাম হলো গোকুলনগর, গোকুলনগর ইয়ুথ ক্যাম্পে দেখি বানের জলের মতো যুবক ছেলেপেলেরা

আসছে।

প্রশ্নঃ এটা কি নরসিংন্দীতে ?

উত্তরঃ না, আগরতলা, গোকুলনগরে তো অখানে আমাকে দ্বায়িত্ব ছিল ব্যাটালিয়ন কোয়াটার মাস্টারের।

প্রশ্নঃ আপনাদের নিয়ে গেলেন কে ? কোন সেক্টর কমান্ডার ছিল ?

উঃ ইন্ডিয়ান আর্মীর লোকজন, বি এস একের তারা। এটা মনে হলে এখনো আমার গা শিউরে উঠে সে কি আগ্রহ কি উদ্দী-পন আর কি তেজ । সবাই বলে আমি যুদ্ধে যাব। যুদ্ধে যেতে হলে ইয়ুথ ক্যাম্পে কিছু দিন থাকবে , ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে বাছাই করে যেখানে ট্রেনিং ক্যাম্প ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এরই এক পযায়ে আমি আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্নীয় আমার ফুফা মোফাজ্জল হোসেন বীরপ্রতীক পাকিস্তান নেভির সাবমেরিন ক্রু ছিলেন , ছুটিতে ছিলেন দেখে উনাকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম আগরতলী, উনারাতা আর্মি নেভির কাজ করবে। হঠাৎ করে গোকুলনগরে যেয়ে হাজির যে শাহজাহান বলল কলিকাতা যাই। কলিকাতা কেন? কলিকাতা ওখানে একটা ট্রেনিং হবে । ঐ ট্রেনিং এ আমরা যাব কিছু নেভি ফরম হবে।

তো আমি ছোটবেলা থেকে কলিকাতা নাম শুনেছি , কলিকাতা কোনদিন যাই নাই, আমি আক কথাই রাজি হয়ে গেলাম। আচছা ঠিক আাছে যাব। কিন্তু কীজন্য যাব, কি এ সব জানি-না। তো ওখান থেকে ছুটি , নিতে হয়। নিয়ে একবারে ক্লোজ করে দিয়ে আমরা ট্যাকে করে গরু ছাগল যেভাবে নেয় এভাবে পাহাড়ী রাস্তা অনেকে ব্যাবস্তা করল। সারারাত ট্যাকে আমাদের নিয়ে গেল। নিয়ে নামিয়ে দিল ধর্মনগর নামে একটা জায়গায়। এটা হলো বর্তমানে আমাদের সিলেটের করিমগঞ্জ এলাকা। ধর্মনগর রেলস্টেশন থেকে রেলে করে আমরা গেলাম গোহ-াটি , লামডিং জল্পাইগুড়ি কুচবিহার, তখন ফারাক্কা রেল চালু

হয়নাই । ফেরী দিয়ে পার হলাম , আমরা গেলাম হাওড়া রেলস্টেশন হাওড়া থেকে পরে আমাদের ইন্ডিয়ান আমির্ব লরিতে করে শিয়ালদা রেলস্টেশন নিএ আসল শিয়ালদা থেকে পরের দিন রাতে ট্রেনে করে আমাদেরকে আবার উত্তর দিকে নিয়ে গেল । নিয়ে একজায়গায় নামিয়ে দিল, সকালবেলা নেমে দেখি একটা গ্রামিন রেলস্টেশন ।ওখান থেকে আমাদেরকে আবার লরিতে করে নিয়ে গেল ৭/৮ কি মি. দূরে । নিয়ে যেয়ে এক জায়গায় নামিয়ে দিল । ওখানে যেয়ে রোড টা বাইন্ড হয়ে গেছে। দেখলাম যে একটা মনুমেন্টের মত দেখা যায় , মিনারের মত, কাছে গেলাম যেয়ে দেখি লিখা আছে ইংরেজিতে Battle field of palashi ১৭৫৭. তখন আর আমরা বুঝতে আর বাকী রইলনা এই সেই সর্বনাশ পলাশী যেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অস্তমিত। হয়েছিল। আর আজকে আমাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে প্রশিক্ষণের জন্য । ঐখান থেকে আমাদের প্রশিক্ষণ স্থল আরও ২/২.৫ কি মি.পশ্চিমে , ভাগীরথী নদীর তীরে । সেই ঐতিহাসিক ভাগীরথী যেখানে রানী ভবানীর বাড়ি নদীর ঐপাড়ে । ওখানে যেয়ে দেখলাম আরও ছেলেপেলে চলে এসেছে এবং তাদের দেখে এখন বলতে দ্বিধা নেই সবাই দিগম্বর, শুধু খালি আন্ডার গামেন্টস পড়া সবাই। আর গায়ে কিছুই নাই। আমাদেরকে বলল যে তোমরা সব খুলে ফেলো । আমরাও খুলে ফেললাম । বলল , তোমাদের এখন ট্রেনিং হয়ে টেস্ট হবে কে সাতার পারে কে না পারে । ঐ সাতারের উদ্দেশ্য হল ভিন্ন যা আসলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল সেটা হল অপারেশন জ্যাকপট। সেই পৃথিবীখ্যাত যে অপারেশন, সে অপারেশন জ্যাকপটের আমি একজন দুর্ধর্ষ কমান্ডার। আমরা সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা নই। সেই প্রশিক্ষণস্থল পলাশী এবং ভাগীরথী নদী। নদীতে আমাদের প্রশিক্ষণ হল।

প্রঃ কতজন ছিল পলাশীর ঐ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে?

উঃ প্রথম পর্বে আমরা ১৫০ জনের মত প্রশিক্ষণ নিয়েছি পরে ঐ সংখ্যা আরো বেড়েছে।

প্রঃ পলাশীর প্রশিক্ষণের ডেট টাকি মনে আছি?

উঃ জুলাই মাসটা পুরু। আমরা জুনের শেষের দিকে গেলাম পলাশী এর আগের করা গেছে বিশেষত ফরিদপুর থানার কুষ্টিয়া এলাকার ছেলেরা এরা আগেই শুরি করেছে। আমাদের প্রশিক্ষক করা ছিলেন সবাই ইন্ডিয়ান লেডি। আর ছিলেন আটজন সাবমেরিন পাকিস্তান নেভির সাবমেরিনের ক্রু ছিলেন। কমোডোর এ ডব্লিউ চৌধুরী পরবর্তীকাল আর তার ওখান থেকে পাসপোর্ট নিয়ে পালিয়ে ফ্রান্স থেকে গ্রিস হয়ে আরও বিভিন্ন দেশ সুইজারল্যান্ড আরও বিভিন্ন দেশে ঘুরে তারা ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে আশ্রয় নিয়ে খান থেকে দীল্লী এসেছিলেন। দিল্লী থেকে তারা পলাশীতে এসেছেন। তাদেরকে কেন্দ্র করে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গড়ে তোলা হয় এবং আমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা ফ্রগম্যান মানে ব্যাং। ব্যাঙ্গের আবার সর্দি কি? দিনরাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে আঠার ঘন্টাই পানিতে প্রশিক্ষণ। মাঝে মধ্যে শরীর শুকনা। প্রশিক্ষণ হল একটা মাইন। নাম লিমপ্যাড মাইন আমাদের পেটে বেধে, ব্যাক ষ্ট্রোকে সাতার বেটে শত্রুর জাহাজে যেতে হবে। জাহাজ ডাইভ করে এটাকে লাগাতে হবে। লাগিয়ে আবার সেইফলি চলে আসতে হবে। এটাতে ডিলে সিস্টেম আছে। ডিলে সিষ্টেমে বাস্ট হলে ওটা উড়ে যাবে সাপের মতো কোন আওয়াজ হবে না। আর আমরা সাতার কাটবো ফ্লিস দিয়ে ফ্লিস হলো সমুদ্রে ডুবুড়িরা যে যায় তাদের পায়ের মধ্যে জুতার মত দেখা যায় আর অনেক্ষণ পানিতে ভেষে থাকা যায়। হাত দিয়ে আমরা সাতার কাটতাম না। হাত ফ্রি থাকবে অপারেশনের জন্য। যুদ্ধ করার জন্য লিমপেড মাইন খুলে ফিট করার জন্য। আর আমাদের একটা কমান্ডো নাইফ দেওয়া হত। দুদিকে ধারালো একটা ছুরি দিয়ে আমরা জাহাজের গা পরিষ্কার করতাম। কেন? লিমপেড মাইন হলো ম্যাগনেটিক মাইন। জাহাজের বডি ষ্টীলের যেখানে শামুক, ঝিনুক, শ্যাওলার আস্তরণ থাকে। তাই এটাকে পরিষ্কার করতে হবে।

নিয়ম হলো পানির সারফেস থেকে ২/৩ ফুট নিচে মাইন লাগাতে হবে। ২/৩ ফিট নিচে কিভাবে যাব। আমি ওয়ানে যেতে খুব কৌশল করে ডুব দিয়ে সাতার দিয়ে জাহাজের আড়ালে গেলাম। ওখানে শত্রুবাহিনী স্টেনগান নিয়ে পাহাড়া দিচ্ছে। আমাকে দেখলেতো ফায়ার করে দিবে। ওখানে একটা ছায়া আছে ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে ট্রিনিং ট্রিনিং ছিল আমাদের। নিঃশ্বাস অনেক্ষন নিয়ে রাখতে পারতাম। ডুব দিয়ে ২/৩ফিট নিচে বেয়ে আবার সমসাময়িক বিষয়টা কল্পনা করেন আপনারা নতুন প্রজন্ম যে নদী স্রোত আছে আবার জাহাজ ধরার জন্য কিছু নাই। আপনাকে স্রোতে টেনেপিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেই অবস্থায় এটাকে একটা ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন স্থায়ী পজিশনে আপনাকে মেইনটেইন করতে হবে। তাহলে পায়ে আপনি সাতার কাটছেন হাত কাজ করছেন ব্রিদিং নিচ্ছেন, নিচে ডুব দিচ্ছেন, দিয়ে ঐ জায়গা কমান্ডো নাইক দিয়ে পরিষ্কার করেছেন। একবারে না হোক ২ বারে ৩বারে যা হোক পরিষ্কার

করে আমরা জাহাজের গায়ে মাইনটা লাগাতাম, এই ট্রেনিং এর পাশাপাশি আরেকটা ট্রেনিং হল। যদি তুমি অপারেশনে যাওয়ার পথে বা অপারেশন করে শত্রুর কর্তৃক আক্রমনের শিকার হও তাহলে জীবন বাঁচানোর জন্য কী করবে। কারন আমরা তো কোনো ক্যারি কতাম না। মাইন নিয়ে গিয়েছি, মাইন লাগিয়ে দিয়েছি, এখন চলে আসছি এখন সাধারণ পাবলিকের মত। সেজন্য আমাদেরকে আনআর্মড কমব্যাট বলে মানে অস্ত্রছাড়া যুদ্ধ করা যেটাকে আপনারা জুডো বলেন।
জুডোরই উচ্চ প্রশিক্ষন সেটা, যেটা জাপানীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সময় করেছে। আমরা কমান্ডো এ জন্যই বছা৭তে পারি। আমারা যে কোন একজন শত্রুকে খালি হাতে ঘায়েল করতে পারি। আমরা ১১ নম্বর প্যাচঁ এখনো মনে আছে আমরা ৫নম্বর, ৭ নম্বর প্যাচ বলে আকি। আমাদের প্রশিক্ষক ছিলেন কমান্ডো নানা কেন্দ্র ইন্ডিয়ান মারাধা সেনাবাহিনীর এই দুইটা প্রশিক্ষণ খুব ভালভাবে আমাদের নিতে হয়েছে। তো এখানে বলা হত কঠিণ প্রশিক্ষণ সহজ যুদ্ধ। বয়স যেহেতু কম তখন সাড়ে তেইশ বছর বয়স তখন এই কষ্ঠ কষ্ঠই মনে হয় নাই। এভাবে আমরা প্রশিক্ষণ নিয়ে আগষ্টের ফাষ্ট উইকে আমরা প্রায় ১৫০ জন

কমান্ডো যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত না উম্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। কেউ কেউ স্বপ্নে চিৎকার করতো যে আমি অপারেশনে যেতে চাই। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা দের সাথে আমাদের পার্থক্য এটা।

প্রঃ এটাতে বহুবিধ ধারা বহুমূখী একটা ট্রেনিং ছিল। আপনারা ১৫০ জনই এই ট্রেনিং দিয়েছেন। পরবর্তীতে আরও মুক্তিযোদ্ধারা গিয়েছেন এই ট্রেনিং এ।

উঃ ১৫০ জনের যে ফাষ্ট ব্যাচটা সেটাই আসলে তোলপার করে দিয়েছে বাংলাদেশ পাকিস্তানে। এরপর যারা গেছে সর্বসাকুল্যে ৫০০র মত। সবাই প্রশিক্ষণের সুযোগ পায় নাই। কারণ ধাপে ধাপে হ"ছল। আমরা যারা আগষ্টে এসেছিলাম আমরা চট্টগ্রাম পোর্ট চাঁদপুর নৌবন্দর, দাউদকান্দি ফেরিঘাটে আমি নিজে করেছিলাম। আমরা ৮জন কমান্ডো নারায়নগঞ্জ নৌবন্দর আর খুলনাতে মংলাপোর্ট এই পাঁচটি জায়গায় একই দিনে একই তারিখে একই সময়ে সিরিজ হামলা যেটা আপনারা শোনেন এখন এটা আমরাই একসময়ের সন্তানরা আমরাই প্রথম করেছি বাংলাদেশে। আমরা এই ৫ জায়গায় একই সাথে কমান্ডো এট্যাক করেছিলাম।

প্রঃ আপনি একই সময়ে ৫ জায়গায় ছিলেন উপস্থিত? মানে আপনাদের দলটা গ্রুপটা?

উত্তরঃ আমিনা গ্রুপ চিটাগং পোর্টে ছিল ৬০ জন কমান্ডো, টোটাল সংখ্যা ছিল ১৫০ জন। ১৫০ জনের মংলা পোর্টে যারা যাবে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে তাদের অনেক সময় লেগেছে প্রায় তিন চার দিন। আর আমরা যারা এই সাইডটায় করলাম এই সাইডে আমাদের আগরতলা নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্লেন একরে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে একটি বাবুড়ার প্লেন একরে সিঙ্গাপুর। ওখানে আমাদের এক জায়গায় রাখা হল, নাম ছিল নিউক্যাম্প, নিউক্যাম্প একটা গোপনীয় ক্যাম্প। আমরা কী করি কেউ জানত না। আমাদের কোন সেক্টর কমান্ডার ছিলা না। আমরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহম্মদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আর জেনারেল এম এ জি ওসমান যিনি সেনাবাহিনী প্রধান উনার অধীনে ছিলাম। আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম ওখান থেকে আমাদের ভাগ করে দেয়া হল। আমি ছিলাম নারায়নগঞ্জ টিমে। সাবমেরিনের আব্দুর রহমান ছিলেন গ্রুপ লিডার। হঠাৎ আমরা অপেক্ষা করছিলাম কবে আমরা যাব টার্গেটে। উদ্দ্যেশ্য তখন ক্যাপ্টেন দাশ, ইন্ডিয়ান নেভির লেফট্যানেন্ট কমান্ডার দাশ ডেকে পাঠালেন। ডেকে বললেন সিদ্দিক সাহেব বসেন। বসলাম। বাংলাদেশে ২০০৩ সালের আগে মোবাইলের প্রচলন ছিল না। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কথা বলতে হলে টিএনটি আর পুলিশের ছিল ওয়ারলে। তা আমরা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম একটু আগে বল্লাম বাংলাদেশের ৫টি টার্গেটে একই দিনে একই সময়ে একটা সিগন্যাল এ আমরা অপারেশন করেছিলাম। সিগন্যাল ছাড়া সেটা কীভাবে সম্ভব ছিল। আমাদের কাছে তো মোবাইল বা ওয়ারল্যাস কিছু ছিল না। আমাকে লেফটেন্যান্ট দাশ বললেন বহিলা গান শুনবেন? বললাস শুনব। বললেন বসুন। আমি বসলাম । বসার পর একটা টেপ রেকর্ডার উনি বাজালে এই রেকর্ডারে যতগান হচ্ছে তার মধ্যে একটাগান হচ্ছে পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া গান "আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান তার বদলে চাইনি কোন প্রতিদান" । এরপর আবার সন্ধা মুখোপাধ্যায় এর গান "আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুড় বাড়ি তোরা সব উলুধ্বনি কর"। এই ২টা গান আরও অন্যান্য গান। শোনার পর আমার কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করলেন। আমি হ্যাঁসূচক জবাব দিলাম । আবার বাজালেন তারপর টেপরেকর্ডার বন্ধ করে বললেন মি.সিদ্দিক এই গান সেই গান নয়। এই গান যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেবে । আপনার নাম নারায়নগঞ্জে যে টিম ওখানে দেয়া , আপনাকে নারায়নগঞ্জ যেতে হবে না । যেতে হবে দাউদকান্দি ৮

জন কমান্ডোর একটা টিম যাবে সেই টিমে আপনি নেতৃত্বে দিবেন। তো বাকি যে ৪ টা টিম আছে সেগুলোর প্রত্যেকটার নেতৃত্বে আছে সাবমেরিন ক্রুর কথা বলেছিলাম তারা, একমাএ নেভির বাইরে বা আর্মির বাইরে আমি একজন সিভিলিয়ান, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ইয়াং ছাএ, আমাকে এ দায়িত্ব যখন দেয়ার কথা বললেন আমি খুব শিহরিত হলাম , আনন্দিত এবং রোমাঞ্চিত হলাম। তাহলে এই গান দিয়ে কী বোঝায় । আপনাকে এবং বাকী টিম লিডারদের প্রত্যেককে একটা করে ট্রানজিস্টর দেয়া হবে। আপনারা যাবেন আপনাদের টার্গেটের কাছে যেয়ে সেন্টার আপনাদের জন্য ঠিক করে রাখা হবে সেখানে আপনারা থাকবেন ।জয়বাংলা আমারা বলতাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে ,জয়বাংলার অনুষ্ঠান ।

শুনে সবাই, মুক্তিযোদ্ধারা শুনবে আপনার সাথের কমান্ডাররাও শুনবে, গানটান শুনবেন, আকাশবানী কলকাতা শুনবেন, আপনার সাথীরা জিজ্ঞেস করলে এটা কি বলবেন শোনার জন্য এইজন্য এটা নিয়ে আসছি, কিন্তু এটা যে সিগনালের কাজ করবে এটা আর কাউকে বলা যাবেনা, তো শুধু আমি জানি আর কেউ জানেনা, প্রথম গান কি শুনলাম আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান চাইনি কোনো প্রতিদান, এই গানটা অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতা সেন্ডার থেকে প্রতিদিন সকাল ৯ টায় আর রাতে ৮ টায় আরেকটা অনুষ্ঠানে অন্যান্য গানের সাথেই গানটা বাজতে পারে, যখনই গানটা বাজবে বুজতে পারবেন যুদ্ধের প্রস্তুতি, স্টান্ড টু অপেক্ষা করতে থাকুন দ্বিতীয় গানটার জন্য, নারীকণ্ঠে আজকে যাবে আমার পুতুল শশুড় বাড়ি, এই গানটা শোনার জন্য, দ্বিতীয় গানটা শোনার পর হিসাব করবা যখন গান শুনলা তার থেকে ২৪ ঘন্টা বা ০০ আওয়ার এ তোমাকে টার্গেট হিট করতে হবে, সেটার হিসাবটা আমার মাথায় মনে মনে করি, আমার অপারেশনটা একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল একটা কারনে, রাস্তায় আমার গাইডটা অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল, ১৫ আগস্টে অপারেশনের জন্য আমরা সিগন্যাল পেয়ে গেলাম, ১৫ আগস্টে করতে পারিনাই, আমি করেছি ১৬ আগস্ট দিবাগত রাতে, প্রথম সিগন্যাল গানটা শুনলাম, আমার যে ডিউটি কমান্ডার মতিউর রহমান সে বীরউত্তম, আমি বীরপ্রতিক লিডার হয়ে, আর সে বীরউত্তম, এত সাহসী যোদ্ধা ছিল, তারে বললাম মতি চল যাই, দাউদকান্দি ফেরী ঘাটে কি করে আসি, আমরা ছিলাম বন্দরামপুর, বন্দরামপুরের পীর সাহেব আল্লাম শাহ কামাল এর বাড়িতে আছি, কে সন্দেহ করবে আমরা মুক্তিযোদ্ধা, পীর সাহেব খুব সস্নেহে আমাদেরকে রাখছেন। উনার ফ্যামিলি ওয়াইফ এবং সন্তানদেরকে শশুড়বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন, পেছনের ঘর যেটা ফ্যামিলির ঘড় ওই ঘরে আমাদের থাকতে দিয়েছেন নিরাপদে, অথচ টের পেলে উনাকে গুলি করে মেরে ফেলতো, তো মুক্তিযোদ্ধ আর স্বাধীনতা এককভাবে কেউ করেনাই, সবার সম্মিলিত চেস্টা, উনাদের ত্যাগ রয়ে গেছে, উনি বন্দরামপুরের পীর সাহেব হিসেবে খ্যাত ছিলেন, আল্লামা শাহ কামাল আমাকে ডাকতেন পুত, কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষায় পুত্রকে বলে পুত, পুত তুই কেমন আছিস?

তখন আবার আমরা যুদ্ধের ময়দানে দাড়ি গোফ কাটার মতো রেজারের সংস্থান নাই, তো ন্যাচারালি আমাদের সবারই দাড়ি বড় হয়ে গেছে, পরেছি ফতুয়া, উনি তামাক খেতেন, তো বললেন অই পুত হুক্কা জালায়া দে, হুক্কা জালাইতে হলে তো অইখানে রাজাকার টাজাকার ও আসতো, মুসলীমলীগ রা আসতো, এরা জিজ্ঞেস করতো হুজুর এই ছেলে কে? বলতেন এটা আমার পুত, আমার খেদমত করে, তো আমি আরো কথাবার্তা শুনি আর কি, আমি পানটান খাই, মাথায় টুপি পরি, সবাই ভাবে মাদ্রাসায় পড়ি, মজার ব্যাপার আর কি, মনে হলে হাসি পায়, আমাকে সালাম দিতো আসসালামু আলাইকুম হুজুর, আমি সালাম নিতাম, আর মনে মনে ভাবতাম, এই মৌলভি সেই মৌলভি না, রাতের বেলায় টের পাবি।

মতিরে নিয়া ১৩-১৪ তারিখ দাউদকান্দি গেলাম, হুজুর নৌকা ঠিক্ করে দিলো, ছইওয়ালা, ওখানে যেয়ে দাউদকান্দি ফেরিঘাটের অবস্থা। ফেরি কোথায় থাকে। বাঙ্কার দেখা যায়না কিন্তু নাড়াচাড়া দেখা যায়। দেখে আমরা চলে আসলাম। ১৫ আগস্ট পারি নাই এজন্য যে গাইড আমাদের দিবাগত রাতে নিয়ে যাবে একজনের নাম মান্নান, আরেকজনের নাম কাশেম ওরা রাস্তায়। আমরা খোলা নৌকায় যাচ্ছি। আমরা কমান্ডোরা তো শুধু দিগম্বের মত আন্ডারওয়্যার পরা থাকি। সরিষার তেল মেখে আর কমান্ডো নাইফটা থাকে। আর একটা করে

লিমপেড মাইন। এই আমাদের অস্ত্র আরকি। মাঝপথে যাওয়ার পর প্রচন্ড বেগে ঝড় তুফান শুরু হল। বৃষ্টিতে ভিজে সব সয়লাব। আমরাতো ফ্রগম্যান ট্রেইনড, আমাদের কিছু হয়নি। কিন্তু ২ গাইড, মান্নান সম্ভবত ঠকঠকিয়ে কাঁপছিল। সে বলল সে যেতে পারবেনা আমাদের সাথে। দেখলাম মহা বিপদ। সে না গেলে মাঝে কোথাও নামিয়ে দিলে সে তো সবাইকে সব বলে দিবে। আমাদের অপারেশন ভুল হয়ে যাবে এবং অন্যান জায়গায় যে অপারেশন সেগুলোও ভুল হয়ে যাবে।

এই নিয়ে দহরম মহরম করতে থাকলাম। একজন একজন বলল, স্যার তাকে শুট করে ফেলি। স্টান গানও ছিল। আর না হলে কমান্ডো নাইফ দিয়ে মেরে লাশ ফেলে দেন এখানে। কিন্তু তাকে গাইড দিয়েছে তো আরেক কমান্ডো ক্যাপ্টেন আদার। ক্যাপ্টেন আদারের লোক ওকে মেরে ফেললে আমি যখন ফেরত যাব আমাকে আবার মেরে ফেলবে। না কিছু চিন্তা করে দেখি। সুবহা সাদিক হয়ে গেছে। তখন তো কমান্ডো অপারেশন করা যাবেনা। কমান্ডো অপারেশন হলো শত্রুর সু-রক্ষিত দুর্গে অতিক্রিত হামলা চালিয়ে।

তাদের ভয় বা ক্ষতি সাধন করে নিরাপদে ফিরে আসা । দিনের আলোতে গেলে তো আমাকে ধরে ফেলবে তাই ১৫ অগাস্টের অপারেশন হয়ে গিয়েছিল, পরের দিন ১৬ অগাস্ট হুজুরকে বললাম আমাকে ২টা নৌকা দিবেন একটা হল ছোট কোষা নৌকা আরেকটা ছইওয়ালা নৌকা পরের দিন রওয়ানা হলাম ছইওয়ালা নৌকাটা ২/৩ কিলোমিটার দূরে লাগিতে গেথে রাখলাম । কোষা নৌকা ৩জন ৩জন করে কমান্ড উঠ-ালাম । টার্গেট ঠিক করা আছে ২টা ফেরী ওখানে নোঙর করা মেঘনা নদীতে। আর ফেরীঘাট যেটা পল্টন সেখানে আমি নর"ল ইসলাম আর হাসাননুর ৩জন করে পানিতে নামিয়ে দিলাম। তাদেরকে টার্গেট বলা আছে ।

১নম্বর ও ২ নম্বর ৩ৎফ ঃধৎমবঃ সবচেয়ে ভয়ংকর কারণ এখানে স্থাল্ভাগ জল ২টা শএুর বাঙকার ও থাকতে পারে ঐটাতে আমরা । আস্ড়ে আস্ড়ে ব্যাকট্রোকে সাতার দিয়ে কচুরিপনা

মুখের উপর দিয়ে যাতে কেউদেখেল ভাবে কচু-রিপনা ভেসে যাচ্ছে । আমাদের হাত তো নড়ে না শুধু পা দিয়ে সাতার কাটছি । টার্গেট পৌছে গেলাম টার্গেট পৌছে আমাদের ৩গ্রুপ আর ২ গ্রুপ তারাও টার্গেট পৌছে লাগিয়ে দিয়েছে বলে ধারনা করছি । সবাই এসে আবার একে একে কোষা নৌকায় করে বড় নৌকায় উঠবে । আমরা মাইল লাগানোর পরে মাইনের একটা ক্যাম আছে খুলে নিয়ে আসতে হয়। সেটা জিলে সিস্টেম । ক্যাম্পটা আইসক্রিম বারের মত , লিমপেড মাইনের বাইরে থাকে । এটার মধ্যে স্ট্রাইকার লাগানো থাকে ।

স্ট্রাইকারের শেষের দিকে ডেটোনেট ও বলে। এই স্ট্রাইকারটা একটা স্প্রিং এর সাথে ক্যামিক্যাল এর সাথে আটকানো থাকে । ক্যামিক্যাল সল্টটা পানির সংস্পর্শে আসলে গলে যায়। এটা যাতে না গলে সেজন্য উপওে প্লাস্টিকের একটা ক্যাপ আছে। আমরা কমান্ডোরা মাইনটা জাহাজ বা ফেরিতে ফিট করার পর ক্যাপ খুলে নিয়ে আসতে হবে। ক্যাপ না খুললে অ্যাকটিভেট হবে না। ক্যাপটা খুললে কেমিকেল সল্ট না গলতে থাকবে পানিতে। গলে যখন দুর্বল হয়ে যাবে তখন স্ট্রাইকারটা স্প্রিং থেকে ছুটে ফোর্সে যেয়ে ডেটোনরকে হিট করবে। তারপর স্পারকিং হবে। সাথে সাথে প্রচন্ড বেগে ভুমিকম্পের মত লিমপেড মাইন বার্স্ট হবে এবং এই গলতে যে সময়টা হিসেব করে দেখা হয়েছে ট্রেনিংয়ের সময় তা ৪০ মি: থেকে ৫০মি: আমরা তো রেসকিউ সেফে চলে যেতাম। আবার ধরা পড়লে ওখানেই শেষ। আমরাতো আগেই মাফটাফ চেয়ে যেতাম। বাবামাকে তো দেখবোইনা। ৬ মাস বাবামার সাথে দেখা নাই যোগাযোগ নাই, গেলাম পলাশীতে। ট্রেনিংয়ে আগরতলা আবার ফিরে আসলাম । আগরতলা সেখান থেকে দাউদকান্দি অপারেশনে বাবা মার সাথে কোনো যোগাযোগ নাই। বেচেঁ আছি কি মরে গেছি। আমরা দেশ কে স্বাধীন করব । বাং-লাদেশকে স্বাধীন করব সেজন্য জীবনকে উৎসর্গ করেছিলাম। মানে ঐ অপারেশন এ আমরা শেষ, মাইন যদি বার্স্ট হয়ে যায় আমার পেটের মধ্যে আমিতো মরে যাব। তবুও একটা সেফটি এবং আমাদের ইন্ডিয়ান নেভির এরা নাকি বলেছে এই ছে-লগুলা আর ফিরে আসবেনা কারন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দুধর্ষ সেনাবাহিনী। তাদের দুর্গের মধ্যে আমরা ঢুকে যাচ্ছি , মনে করুন চট্টগ্রাম পোর্ট এ কত প্রহরা তার ভিতরে চলে গেছে ছেলেরা। আমি চলে গেছি দাউদকান্দি। নারায়ণগঞ্জ চারদিকে আলোময় তার মধ্যে চলে গেছি।

প্রশ্নঃ দাউদকান্দিতে আপনারা শত্রুর কয়টা ফেরি ধ্বংস করেছেন?

উত্তরঃ ২ টা ফেরি আর পল্টুন। ৩ টা টার্গেট। উড়িয়ে দিয়েছি একদম। তো লাগানোর পর আমরা ছোট নৌকায় করে আমরা বড় নৌকায় গেলাম। রাতের অন্ধকারে কিছু দেখা যায়না। কমান্ডো অপারেশনের সবচেয়ে মোক্ষম সময় হল রাতের অন্ধকারে যখন বড় ঝড় বাতাস বইছে। সকল প্রাণী মানুষসহ যখন নিরাপদ আশ্রয়ে যায় তখন হল কমান্ডো অপারেশনের মোক্ষম সময়। ঘর থেকে বেরিয়ে যুদ্ধে যাওয়ায় সময় কেউ যদি হারিয়ে যায় তাহলে নিয়ম হল পানির উপর হাত এরকম করবে। শুধু পানির উপরে। কিন্তু আমি যেহেতু কমান্ডো আমি বুঝতে পারবো কেউ সমস্যায় আছে। আমার সাথে নজরুল নামে এক ছেলে হাত এরকম করছে। বুঝলাম ও পথ হারিয়ে ফেলছে। রাতের অন্ধকারে মেঘনা নদীতে পথ হারিয়ে ফেলছে। তখন তাকে উদ্ধার করার জন্যে কোষা নৌকা নিয়ে এগিয়ে গেলাম। তাকে টেনে তুললাম। তোলার পর আমরা বড়ো নৌকায় উঠলাম। খালি গায়ে সব আন্ডারওয়্যার পরা। লোকজন দেখলে আমাদের ভাববে পাগল। পানিতে এক মাসের উপর ট্রেনিং করে, পানিতে শ্যাওলা ট্যাওলা, সাবান নাই। গায়ের রঙ এক হয়ে গেছে। বয়সও এক। দাড়ি টাড়ি কামানো নাই, জংলি-টংলি এরকম মনে হয় আরকি ------ (চলবে)

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: কিছু আশা, কিছু প্রত্যাশা

মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারন করতে পারে। তবে তাদেরকে পরিচালনা করতে হয়। পরিচালনার জন্য একজন যোগ্য নেতা দরকার হয়। যার নেতৃত্বে তারা কাজ করে। প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝাপিয়ে পরে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে ঝাপ দিয়েছিলো সারা বাংলাদেশের মানুষ। পাকিস্তানিদের বিতাড়িত করে উপযুক্ত জবাব দিয়ে ছিনিয়ে এনেছিলো স্বাধীনতা।

বাংলাদেশে নির্বাচনী আমেজ শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার সাথে সাথেই সারা দেশ ভাসছে নির্বাচন জোয়ারে। বলা যায় নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলো।

এক সময়ের প্রধান বিরোধী দল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দুর্নীতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কারাগারে আছেন। কিন্তু শোনা যাচ্ছে তাঁর নির্দেশেই দলের প্রথম সারির নেতারা সব নেতাকর্মীকে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন। নানা রকম ঘরোয়া বৈঠকে নির্বাচনের জন্য তৈরী হবার আহবান জানাচ্ছেন।

প্রথম সারির নেতাদের আহবানটাকে তৃনমূল পর্যায়ের নেতারা বেশ গুরুত্বের সাথে দেখছে। তারা নিজেদের মাঝে আলাপ আলোচনা করছে। নেত্রী জেলে সে বিষয়টাও তাদেরকে ভাবাচ্ছে। তবে বিষয়টাকে তারা ইতিবাচক ভাবে দেখছে। তাদের ধারনা জেলে থাকার কারণে খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা আরো বাড়ছে। দ্বিগুন তিনগুন হচ্ছে। জেল খাটাটাই হয়তো তাঁর জন্য সাপে বর হবে। নেতাকর্মীদের এ ধারনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। যারা কর্মের চেয়ে ভাগ্যে বেশি বিশ্বাস করে তাঁদের এমন উদ্ভট ধারনা হয়। বিএনপি'র নেতাকর্মীদেররও হতে পারে। তাদের ধারনা নিয়ে তারা থাকুক।

তবে এ কথা ঠিক যে বাংলাদেশের নির্বাচনে কোন ঘটনা যে কি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে তা কেউ জানেনা। আগাম বলাও যায়না। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে যতবার সরকার বদল হয়েছে তা আহামরি কোন ঘটনার কারণে হয়েছে তা কিন্তু নয়। খুবই সামান্য সামান্য কারণে মানুষ ভোট দিয়ে এক সরকারের বদলে

আরেক সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। কখনও ইয়াসমিনের মতো একজন সাধারণ (!) মানুষ ধর্ষিতা হয়ে খুন হবার কারণে, কখনো সারের কারণে মানুষ খুনের মতো ঘটনাকে কেন্দ্রকরে, কখনো সরকার প্রধানের দাম্ভিকতার কারণে আবার কখনোবা সরকারে থাকাকালীন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার কারণে সরকার বদল হয়েছে।

সরকার বদলের মাধ্যমটা নির্বাচন হবার কারণেই যত বিপদ। নির্বাচন মানে জনগনের রায়। এ রায় কি কারণে কোন দলের পক্ষে বা কোন দলের বিপক্ষে যাবে তা আগে থেকে কেউ জানেনা। কারণ সারা বছর বা চার পাঁচ বছর বঞ্চিত হবার পর ক্ষোভ বিক্ষোভ প্রকাশের জায়গাটা হলো নির্বাচন। জনগনের ক্ষোভ-বিক্ষোব, পাওয়া না পাওয়ার বহি:প্রকাশ ঘটে নির্বাচনে।

একটা একটা ভোট করেই এক কোটি/দু'কোটি ভোট হয়। তাই একজন ভোটার কোন কারণে ক্ষুব্ধ হলেই তার প্রভাব পরে নির্বাচনে।এ জন্যই বুদ্ধিমান সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সাধারণ মানুষের ভাল-মন্দ, সুখ-দু:খ, আনন্দ-বেদনা, সুবিধা-অসুবিধা, শান্তি-অশান্তি নিয়ে ভাবে। যে সরকার ভাবেনা তার পরিনতির তেমনি হয়। জনগন ভোটের দিন মুখ ফিরিয়ে নেয়। বর্তমান যে সময়টা চলছে তা একেবারেই প্রাথমিক কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে। সে হিসেবে আগামী ২৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ১১দশ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নভেম্বরের মধ্যেই মনোয়নপত্র ক্রয় যাচাই বাছাই এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। প্রার্থী মনোনয়ন শেষ হলেই শুরু হবে আসল খেলা। সাধারণ ভোটারদের ঘরে ঘরে যেয়ে ভোট চাওয়ার খেলা। কোন প্রার্থীর জনপ্রিয়তা কতটুকু তারও একটা প্রমান মেলবে এ সময়টাতে। সর্বশেষ প্রমানটা পাওয়া যাবে ভোটের দিন এবং ভোট গণণার পর।

ইতোমধ্যেই বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীরা ভাবতে শুরু করেছে। পাশাপাশি সাধারণ ভোটারদের হালকা পাতলা ভাবাতে চেষ্টা করছে। টেলিভিশন টকশো কেন্দ্রীক রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা শুনলে তা পরিস্কার বোঝা যায়। প্রতি রাতে বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে বিভিন্ন রকম টকশো হয়। এসব টকশোর মধ্যে রাজনৈতিক টকশোর পরিমান নিতান্ত কমনা। সামনে নির্বাচন, এ বিষয়টা রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা যতটা ভাবছে তার চেয়ে ঢেড় বেশি ভাবছে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো। যেন কালই নির্বাচন এমন একটা ভাব টেলিভিশন গুলোর। প্রতি রাতে কোন না কোন রাজনীতিবিদ মন্ত্রী এমপি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বুদ্ধিজীবকে নিয়ে আসা হয় টকশোতে। তারা নির্বাচন কেন্দ্রিক আলোচনা করেন। সাধারণ দর্শক এসব আলোচনা শোনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো। আসলে বাংলাদেশের মানুষ সব সময় রাজনীতিপ্রবণ। তারা রাজনীতি সচেতনও। তাই চায়ের দোকানে বসে আড্ডা গল্পের প্রায় পুরোটা জুড়েই থাকে দেশের রাজনীতি, নির্বাচন ইত্যাদি।

দেশের চলতি নির্বাচনী হাওয়াটা কিছুটা হলেও ইতিবাচক। কারণ দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকা রাজনৈতিক বন্ধাত্বটা কাটা দরকার। ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দলের স্থানটি দখল করেছিলো জাতীয় পার্টির রওশন এরশাদ। শোনতে খারাপ শোনায় তারপরও বলতে হচ্ছে যে রওশন এরশাদকে বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে এক্কেবারেই মানাচ্ছিল না। বাংলাদেশের মানুষ কেন যেন তাকে বিরোধী

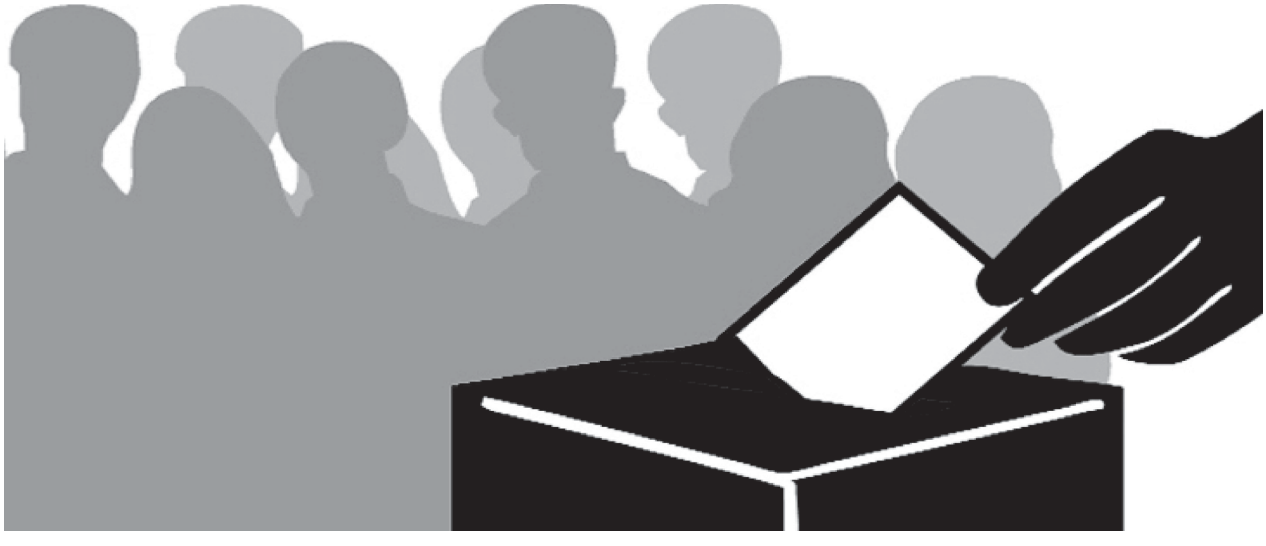

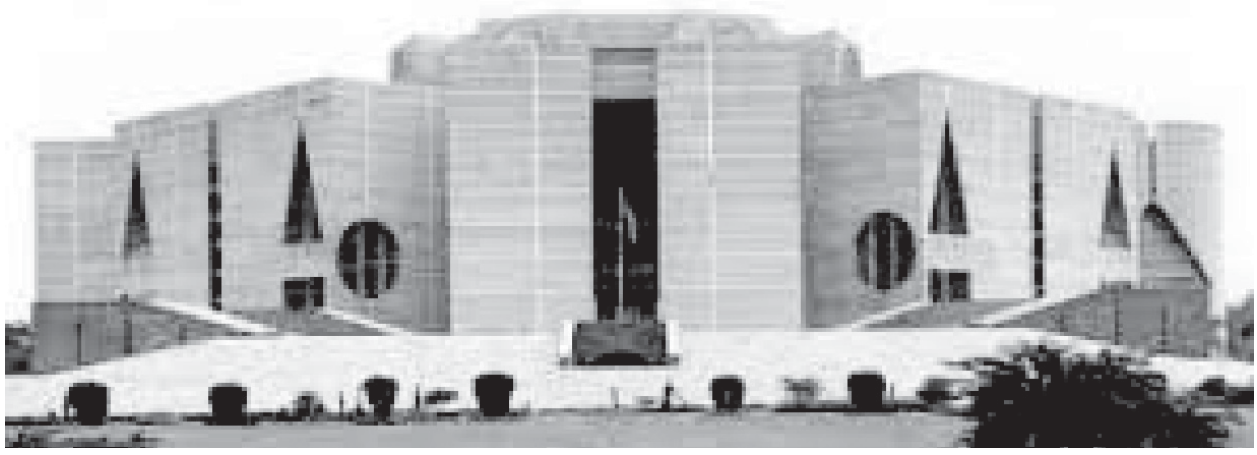

দলীয় নেত্রী হিসেবে মেনে নিতে পারছিলো না।
পারবে কেন? বিরোধী দলের কোন ভূমিকাইতো পালন করেনি রওশন এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি। বলা যায় দলটি সারাক্ষণই সরকারের গুনকীর্তনে ব্যস্ত ছিলো। বিরোধী ভূমিকা পালন করবে কখন? বিরোধী দলের যে রকম অবয়ব থাকার কথা সেরকম কোন অবয়বই দেখা যায়নি জাতীয় পার্টির মাঝে। দলটি ২৩ ডিসেম্বরের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছে। শুধু জাতীয় পার্টি কেন এমন আরো অনেক দলই নির্বচনে অংশ নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নতুন এমন অনেক দলের পোস্টার ঢাকা শহরের দেয়ালে ঝুলছে যাদের নামও কোন দিন শোনা যায়নি। যে কোন নির্বাচনের আগে এমন সব দলের আবির্ভাব হয়। নির্বাচন শেষ দলও শেষ। মাঝখান থেকে কিছু টুপাইস কামিয়ে নেয়। সারা বছর চলার ব্যবস্থাটা হয়ে যায়।
জানা অজানা নানা কারণে এসব দলের আবির্ভাব হয়। এই কারণগুলো সাধারণ মানুষসহ সবাই কমবেশি জানে। কারা এসব দলের মদদ দাতা তা জানতেও কারো বাকি থাকেনা। নির্বাচনে তাদের ভূমিকাটাও রহস্যজনক। কিছুদিন আগ থেকে রাজধানী কেন্দ্রিক এসব দলের আনাগুনা আর তৎপরতা দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছিল যে শিঘ্রই নির্বাচন আসছে। তাই হলো।

বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঠিক হয়েছে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ রবিবার। নিয়ম মাফিক নির্বাচন হবে তাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশে স্বাভাবিক কাজটা সবসময় স্বাভাবিক ভাবে হয়না। নির্বাচনতো না-ই। সরকারি দলগুলো তাদের মত করে নির্বাচনটাকে সাজাতে চায়। শত চেষ্টার পরও যখন বিভিন্নমুখি দেশি বিদেশি চাপের কারণে পারেনা তখনই স্বাভাবিক রাস্তায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়।
জেনারেল এরশাদের পতন হয় ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। তার পতনের পর নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়। এর পর আরো দু'বার একই প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হয়। সর্বশেষ ফখরুদ্দিন আহমেদের অধীনে নির্বাচন হয়। সে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগ পাঁচ বছর রাষ্ট্র পরিচালনার পর ২০১৪ সালে দলীয় সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন হয়। সে নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) যোগদান করেনি। ফলে জাতীয় পার্টি প্রধান বিরোধী দলের স্থানটি দখল করে নিয়েছিলো।
রাজনীতি বিশেষজ্ঞদের মতে এটা ছিলো বাংলাদেশের জন্য এক ধরনের পিছিয়ে যাওয়া। আবার যদি ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির মত আরেকটা নির্বাচন হয় তাহলে কি হবে তা কেবল সময়ই বলতে পারে। সময়ের কাছে আমরা সবাই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য।

আসলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। তবে হ্যাঁ তারা সব সময় আশা করে একটি সুষ্ঠু সুন্দর অবাধ নিরপেক্ষ সকল দলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। যে নির্বাচনে দেশের বড় দলগুলো অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে। যে কারণেই হোক বিএনপি ও আওয়ামী লীগ ছাড়া নির্বাচনকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ নির্বাচন হিসেবে মানেনা। যদিও তাদের মানা না মানাতে যারা সরকার গঠন করে তাদের খুব একটা কিছু যায় আসেনা। তারা তাদের আচার আচরণে তা বুঝিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষের তখন কিছুই করার থাকেনা।
১৯৭০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ১২টা সাধারণ নির্বাচন হয়েছে। তার মধ্যে পাকিস্তান আমলে দুইটা এবং বাংলাদেশ আমলে ১০টা নির্বাচন হয়েছে। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটা এবং জুন মাসে একটা সাধারণ নির্বাচন হয়েছিলো। এই দু'টা নির্বাচন নিয়েই জনমনে নানা প্রশ্ন আছে। আবার নতুন করে প্রশ্ন ওঠেছিলো ২০১৪ সালের ৫ই

জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে। যতই প্রশ্ন থাকুকনা কেন একটা সরকার ক্ষমতার তখল নিয়ে ফেললে সে সরকারকে নামানো অতটা সহজ হয়না। বাংলাদেশের মানুষ তা বার বার দেখেছে। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্যি যে মানুষ ঠেকেও শিখতে পারেনি। শিখার সুযোগ পায়নি। তাদেরকে সব সময় সব কিছু মাথা পেতে নিতে হয়েছে। তবে তারা মাঝেমধ্যে সংগ্রামীও হয়েছে। যার ফল নিহিত আছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, '৬৬'র ছয় দফা আন্দোলন, '৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, '৭০'র নির্বাচন, '৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধ ও '৯০'র গণ অভ্যুত্থানে।

তালিকায় বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন (১৯৭০-২০১৪)

নির্বাচনের নাম	নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাল
পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচন	১৯৭০
পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদ নির্বাচন	১৯৭০
বাংলাদেশী সাধারণ নির্বাচন	১৯৭৩
বাংলাদেশী সাধারণ নির্বাচন	১৯৭৯
বাংলাদেশী সাধারণ নির্বাচন	১৯৮৬
বাংলাদেশী সাধারণ নির্বাচন	১৯৮৬
বাংলাদেশী সাধারণ নির্বাচন	১৯৮৮
বাংলাদেশী সাধারণ নির্বাচন	১৯৯১
বাংলাদেশী সাধারণ নির্বাচন	১৯৯৬ (ফেব্রুয়ারি)
বাংলাদেশী সাধারণ নির্বাচন	১৯৯৬ (জুন)
বাংলাদেশী সাধারণ নির্বাচন	২০০১
বাংলাদেশী সাধারণ নির্বাচন	২০০৮
বাংলাদেশী সাধারণ নির্বাচন	২০১৪

উৎস: বাংলাদেশের নির্বাচন, এসএম শামসুল আরেফিন

বড়ই দু:খের বিষয় এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার ফসল খুব বেশি দিন ভোগ করতে পারেননি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই পরিচালিত হচ্ছে দেশ। ভালই চলছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি এবং সাংবিধানিক সংকট এড়ানোর জন্য নির্বাচন বাধ্যতামূলক। সাধারণ নির্বাচন ছাড়া দেশের কর্নধার নির্বাচন করা যায়না। গণতান্ত্রিক নিয়মে সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন আবশ্যক। সে আবশ্যক কাজটিই হতে যাচ্ছে ২৩ ডিসেম্বর-২০১৮তে। যে প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। বিএনপিসহ সব ক'টি দলই অংশগ্রহণ করছে একাদশ সাধারণ নির্বাচনে। পত্র পত্রিকা রেডিও টেলিভিশন সবখানেই নির্বাচনি আমেজ চলছে পুরোদমে। একটা উৎসব উৎসব ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে সব জায়গাতেই। সে ভাব চলবে নির্বাচনের ফলাফল পর্যন্ত।

আর মাত্র ক'দিন পরেই নির্বাচন। তাই সবক'টি দলই পুরোদমে চালাচ্ছে তাদের নির্বাচনি কর্মকান্ড। যদিও সরকার এবং বিরোধী দলের সবাই ভিতরে ভিতরে নির্বাচনি প্রস্তুতি শুরু করেছে আরো অনেক আগেই। এক সময় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক

সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য ব্যাপক আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে। আজকাল এ দাবিটা অনেকটাই অচল বলে মনে হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মনের জোরটাই হয়তো কমে গেছে তাই তারা জোটবদ্ধভাবে দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচন করতে রাজী হয়েছে। এখন তারা নিজেদেরকে তৈরি করছে নির্বাচনের জন্য। ক'দিন পরই ভোটযুদ্ধ। সে যুদ্ধে কিভাবে জয় লাভ করা যায় সে চিন্তায় মশগুল সবাই। চলছে প্রতিটি দলের মনোনয়ন পত্র জমা ও যাচাই বাছাই। এ মাসের মধ্যেই শেষ হবে চূড়ান্ত প্রক্রিয়া।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সময়ে নির্বাচন হলে মানুষের ঘরে ঘরে যেয়ে ভোট চাবার জন্য মাত্র ১৯/২০ দিন সময় পাবে প্রার্থীরা। তাই প্রতিটা দিন ক্ষণ মূহুর্ত তাদের কাছে মহা মূল্যবান। সে কারণেই কার অধীনে নির্বাচন হচ্ছে সে বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাচ্ছেনা তারা। তাছাড়া এ কথাও ঠিক যে দলীয় সরকারের অধীনে একটা নির্বাচন যদি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হয় তাহলে উদাহরণ সৃষ্টি হবে।

যে উদাহরণ সৃষ্টিটা বাংলাদেশের জন্য দরকার। পৃথিবীর অনেক দেশের রাজনৈতিক নেতারাই নির্বাচনে হেরে যেয়ে বিরোধী/প্রতিদ্বন্দীকে ক্ষমতায় বসার জন্য সাদরে আমন্ত্রণ জানায়। আমরা, বাংলাদেশের মানুষরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আর ভাবি কবে বাংলাদেশে এমন দৃশ্য দেখা যাবে? কবে আমরা সহজে মেনে নেবো একে অপরকে? সে ভাবনা থেকেই বলা যায়, একটা সময় ছিলো নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন ছিলো। এখন সে প্রয়োজনটা আছে কি না তা গবেষণার বিষয়। এ নিয়ে সারা বছরই গবেষণা হচ্ছেও। ফলাফল আমরা কমবেশি সবাই জানি। দরকার একটু বাস্তব অনুশীলন।

বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সে গবেষণার বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। নির্বাচন সময় বা নির্বাচন পরবর্তী সময় অবস্থা কি দাঁড়াবে তা-ই দেখার বিষয়। আর যাই হোক শুরুটাতো হয়েছে।

বিশ্বাসের জায়গাটা যদি শক্ত হয় তাহলে এই এসিড টেস্টের ফলাফল খুব একটা খারাপ হবে বলে মনে হয়না। পারস্পরিক বোঝাপরার মাধ্যমে বিরোধী দলগুলো যে ঝুঁকিটা নিয়েছে তার জন্য দেশের সাধারণ মানুষ তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এর ফলাফলের জন্য। সারা বিশ্বে একটা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় কিনা তা দেখার জন্য।

লেখক -
কলামিষ্ট, সাংবাদিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খন্ডকালীন শিক্ষক

তৃণমূল ভাবনায় সংসদ প্রতিনিধিদের যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস নিয়মিত আয়োজন তৃণমূল ভাবনা নিয়ে মুখোমুখি হয় তৃণমূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে।

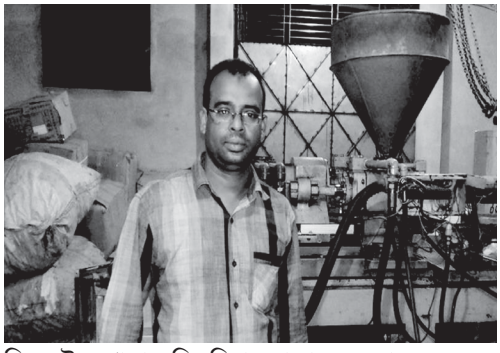

সিলেটের গোলাম কিবরিয়ার ঢাকায় ব্যবসা করেন।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কোন এলাকার ভোটার ?

গোলাম কিবরিয়া : ঢাকা-২ আসনের ভোটার

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নাগরিক অধিকার নিয়ে কতটুকু ভাবেন?

গোলাম কিবরিয়া : আমি মনে করি আমরা নাগরিক অধিকারের দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে আছি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে সে অধিকার প্রাপ্তি কতটুকু?

গোলাম কিবরিয়া : স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করছি কেউ বাধা দিচ্ছে না।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন সংসদ প্রতিনিধির কেমন যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া দরকার?

গোলাম কিবরিয়া : সমাজ সেবার মনোভাব থাকতে হবে ।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন সংসদ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন হওয়া উচিত?

গোলাম কিবরিয়া : সর্বনিম্ন ডিগ্রি পাশ হওয়া উচিত

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : বিগত দিনগুলোতে ভোটের পরিবেশ কেমন ছিল?

গোলাম কিবরিয়া : আমি তো খারাপ কিছু পাই নাই।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার ভোট কি আপনি কখনো হারিয়ে ফেলেছেন ?

গোলাম কিবরিয়া : না একবার একটু ঝামেলা হয়েছিল পরে খুজে পেয়েছি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : কেমন বাংলাদেশ আপনার স্বপ্নে ধরা দেয়?

গোলাম কিবরিয়া : পৃথিবীর উন্নতশীল দেশের সাথে বাংলাদেশ যেন এক সাথে চলতে পারে এ স্বপ্ন দেখি ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মো. ইমরান ঢাকায় রং মিস্ত্রীর কাজ করেন

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার নির্বাচনি এলাকা কোনটা?

ইমরান : ব্রাহ্মণবাড়িয়া

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : ভোটার হয়েছেন ? কখনো ভোট দিয়েছেন?

ইমরান : হ্যা, ভোটার হয়েছি, ভোট দিয়েছি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আগামী নির্বাচনে কি ভোট দিবেন ? কখনো কি ভোট হরিয়ে ফেলেছেন?

ইমরান : যদি ঝামেলা ছাড়া ভোট দেয়া যায় তাহলে দিব । ভোট কখনো হারাইনি তবে একবার ভোট দেইনি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : কেন ভোট দেননি ? কোন প্রার্থী কি আপনার পছন্দের ছিল না?

ইমরান : না আমি তখন সৌদি ছিলাম।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন সংসদ সদস্যর কতটুকু শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হয় বলে আপনি মনে করেন?

ইমরান : বি এ পাশ।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নির্বাচনের আগে জনপ্রতিনিধির দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কেমন?

ইমরান : বাস্তবায়ন সবটুকু না হলেও মুটামুটি হয়েছে। তবে একটু ধীর গতি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন জনপ্রতিনিধির কেমন যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

ইমরান : সমাজের কাজ করবে এবং দেশের উন্নয়ন করার মনোভাব থাকতে হবে।

কামরাঙ্গীরচরের মো: শাহানুর দর্জির কাজ করেন

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কোন এলাকার ভোটার

শাহানুর : আমি কামরাঙ্গীরচরের ভোটার

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার এলাকার সংসদ সদস্যের নাম ?

শাহানুর : খাদ্যমন্ত্রী এড. কামরুল ইসলাম।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার দৃষ্টিতে একজন সংসদ সদস্যের কতটুকু শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা উচিত?

শাহানুর : তার সর্বোচ্চ শিক্ষিত হওয়ার দরকার।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন জনপ্রতিনিধির কেমন যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া দরকার?

শাহানুর : সৎ লোক হওয়া দরকার।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নাগরিক অধিকার নিয়ে আপনার ভাবনা কি?

শাহানুর : ঠিকমত কাজকর্ম করতে পারা এবং সুন্দর মত জীবন যাপন করতে পারাকে বুঝি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : ভোট দিয়েছেন কখনো ? আগামী নির্বাচনে কি ভোট ি দিবেন? ভোট কি কখনো হারিয়ে ফেলেছেন?

শাহানুর : হ্যা, ভোট দিয়েছি। আগামীতে ভোট দিব। আমি ভোটের দিন সকাল সকাল যাই তাই ভোট দেয়া মিস হয়নি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার এলাকার উন্নয়ন নিয়ে কিছু বলেন?

শাহানুর : আমার এলাকার রাস্তা ঘাট হয়েছে, ঈদগাহ মাঠ আরো অনেক কিছু হয়েছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি জনপ্রতিনিধি হিসেবে কেমন প্রার্থী আশা করেন?

শাহানুর : তার সমাজ সেবার মনোভাব থাকতে হবে । ভালো গুনাবলী থাকতে হবে।

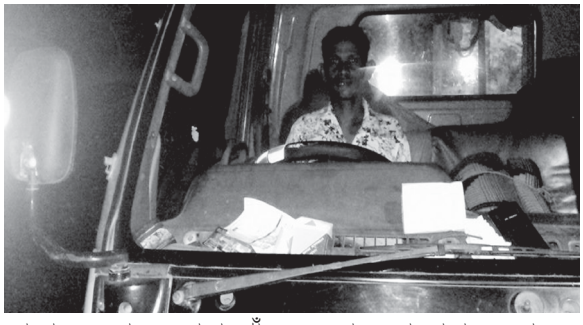

ঢাকা জেলার সোনারগাঁয়ের মো: আনোয়ার হোসেন পিকআপ ভ্যানের ড্রাইভার

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : ভোট দিয়েছেন কখনো? বিগতদিন গুলোতে ভোটের পরিবেশ কেমন ছিল?

আনোয়ার : হ্যা, ভোট দিয়েছি। আমার কাছেতো ভোটের পরিবেশ ভালোই মনে হয়েছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নির্বাচনের আগে জনপ্রতিনিধির দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কেমন?

আনোয়ার : আমার মনে হয় অর্ধেক বস্তবায়ন হয় ।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার এলাকায় কেমন জনপ্রতিনিধি আশা করেন?

আনোয়ার : যে জনগনের সাথে মিলে কাজ করতে পারবে এবং জনগন যাকে পাশে পাবে ।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন জনপ্রতিনিধির কতটুকু শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা উচিত?

আনোয়ার : কমপক্ষে কলেজ পাশ থাকতে হবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আগামী নির্বাচনে কি ভোট দিবেন? আপনার ভোট কি কখনো হারিয়ে ফেলেছেন?

আনোয়ার : ভোট দিব । একবার ভোট দিতে গিয়ে দিতে পারি নাই । তারা বলছে আমার ভোট হয়ে গেছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন জনপ্রতিনিধির কেমন যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া দরকার?

আনোয়ার : দুর্নীতি মুক্ত থাকতে হবে। ভালো মানুষ হতে হবে।

SPECIAL OFFERS
BEST PRICE
Domain & Hosting
with static page(Single)
Only 15,000/-
10,000/-
Taka
BEST PRICE
Domain & Hosting
with Dynamic(Normal)
Only 25,000/-
22,000/-
Taka
BEST PRICE
Domain & Hosting
with Dynamic(eCommerce)
Only 40,000/-
30,000/-
Taka
For More Info Please Call:
01922 102390
www.techsolutionsbd.com

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: ইয়ং ভয়েস

নিজস্ব প্রতিনিধি

সোবাইল ইবনে হামজা (বনি)
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ঃ একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে আসছে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান কেমন প্রত্যাশা করেন?

উত্তর ঃ অবশ্যই বাকি আট-দশজন দায়িত্বশীল নাগরকিদের মত আমিও চাইব আসন্ন জাতীয় নির্বাচন যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটারদের নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্যই বিবেচ্য। আশা করি, সরকার কর্তৃক গৃহীত সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সকলদলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠুভাবে ও কোনোরূপ অরাজকতা ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ঃ কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন?

উত্তর ঃ সত্যি কথা বলতে, একজন তরুণ হিসেবে আমি দূর্নীতিমুক্ত, মাদকমুক্ত এবং বেকারমুক্ত এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ঃ আপনার স্বপ্নের বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে একজন জনপ্রতিনিধির কি ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকা দরকার বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ স্বপ্নের বাংলাদেশ যদি সত্যিই বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে আমাদের জনপ্রতিনিধিদেরকে নিঃসন্দেহে সৎ, চরিত্রবান, উদ্যোমী, পরিশ্রমী এবং সর্বোপরি জনগণের ব্যথায় সমব্যথি হতে হবে। মানুষের

সাথে মন থেকে মিশতে হবে, তাদের দুঃখ-দুর্দশায় পাশে দাঁড়াতে হবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ঃ নির্ভেজাল ভালোবাসা- ব্যাখ্যা দেবেন কিভাবে?

উত্তর ঃ আমি যদি প্রকৃতঅর্থে একজন সুনাগরিক, দায়িত্ববান ও সৎ মানুষ হয়ে থাকি, তাহলে আমার ভালোবাসা সেটা নিজ পরিবারের প্রতিই হোক আর দেশের প্রতিই হোক, স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং নিঃসন্দেহে তা নির্ভেজাল হবে বলে আমি মনে করি।

আরিফ সরকার

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ঃ একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে আসছে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান কেমন প্রত্যাশা করেন?

উত্তর ঃ আসছে নির্বাচন নিয়ে প্রত্যাশা প্রচুর কারণ এই নির্বাচন এ আমি প্রথম বার ভোটার হিসেবে অংশগ্রহন করব। তাই আমি চাচ্ছি সুন্দর একটা পরিবেশ এ নির্বাচন দেখতে যেখানে সকল রাজনৈতিক দল গুলো অংশগ্রহন করেছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ঃ কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন?
উত্তর ঃ বেকার মুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি যেখানে সর্বস্তরের মানুষ কাজ করে রোজগার করছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ঃ আপনার স্বপ্নের বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে একজন জনপ্রতিনিধির কি ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকা দরকার বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ সর্বস্তরের মানুষকে এক ভেবে কাজ করা উচিত।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ঃ নির্ভেজাল ভালোবাসা- ব্যাখ্যা দেবেন কিভাবে?

উত্তর ঃ নিভেজাল ভালবাসা বলতে এটা শুধু বাবা-মা এর ভালবাসা, আর ২টা সময় দেশকে নিভেজাল ভাবে ভালবাসা যায়

* অন্য কেউ নিজের দেশকে নিয়ে যখন কিছু বলে
* দেশের ক্রিকেট খেলা দেখার সময়

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ঃ একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে আসছে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান কেমন প্রত্যাশা করেন?

উত্তর ঃ স্বচ্ছ ও সুষ্ঠ নির্বাচন দেখতে চাই। ভোট কেন্দ্রে জনগনের নিরাপত্তা সহ দূরনীর্তি মুক্ত নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন দেখতে চাই, জাতীয় নির্বাচন সুষ্ট ও সুন্দও হোক আমি এই প্রত্যাশা করি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ঃ কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন?

উত্তর ঃ আমার স্বপ্ন, যে স্বপ্ন আমি দেখি, সামাজিক নোংড়ামি, ধর্ষন বন্ধ করা, বেকারক্ত দূও করা শ্রমিকদেও নেয্য শ্রম নেওয়া, শিশু শ্রম বন্ধ কওে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ঃ আপনার স্বপ্নের বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে একজন জনপ্রতিনিধির কি ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকা দরকার বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ আমার স্বপ্নের বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে একজন জনপ্রতিনিধি যে দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকা দরকার সেটি হচ্ছে জনপ্রতিনিধি হিসাবে আগে একটা ফিল্ড তৈরি করবে যেখানে জনগন এক সাথে কাজ করতে পারবে, বিভিন্ন জরিপ গুলো ঠিক-ঠাক ভাবে হচ্ছে কিনা একজন জন প্রতিনিধি দায়িত্ব ও কর্তব্যেও মধ্যে পওে জনগনের সুবিধা- অসুবিধা গুলো দেখা ও একজন জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

ইসরাত জাহান নিলা

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিসনেস এন্ড টেকনোলজি

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ঃ নির্ভেজাল ভালোবাসা- ব্যাখ্যা দেবেন কিভাবে?

উত্তর ঃ নির্ভেজাল ভালবাসা বলে কিছু আছে আমি মনে করিনা, কারণ সব ভালোবাসার মধ্যেই মনে করিনা। কারন সব ভালোবাসার মধ্যেই একটা স্বার্থ কাজ করে, সেটা দেশের ক্ষেত্রেই হোক বা অন্যান্য ক্ষেত্রেই হোক তারপরও আমরা ভালোবাসি নিজের দেশকে নিজের পরিবারকে এবং জনগনকে।

If you want it we got it.
A firm for all your needs.
We print and supply anything you require.

For Quality Services

MOHAKAL

31, Nandalal Datta Lane, Laxmibazar, Dhaka. Bangladesh

Cell : 01720644040

Rights & Responsibilities of Women Representatives in the Parliament of Bangladesh

Beauty Talukder
Freelance Researcher
b.talukder@yahoo.com

Women's participation in politics is considered as one of the key determinants of women's empowerment and social progress. It is linked to women's empowerment because without noteworthy participation of women in political activities, voice of women will not be reflected in policies and practises. Politics determines resource allocation and distribution of resources in any society. If women's voice remain excluded in politics, whole society will be sufferer from two specific perspectives.

Firstly, political decision will not be democratic and inclusive because it ignores the voice of half of the total population.

Secondly, if women remain excluded from politics, society will not be successful in maximising the potentiality of women. In state centred politics 'parliament' is regarded as the heart of politics. This writing will discuss right and responsibilities of women in parliament of Bangladesh.

State of Women's Involvement in the Parliament of Bangladesh:

It is noteworthy to mention that Bangladesh ranks 8th in Asiain the case of women's representation(The Daily Star, November 27, 2016). This has long legacy with past. Independence movement of Bangladesh, including Six-Point Movement (1966) profoundly influencedthe women's progress in political arena. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has played a key role in opening the window for women's political participation. To accelerate theSix-Point Movement (1966) and open the political opportunities for women.Bangabandhu directed Begum Budrunnesa to open a women wing of Awami League (AL) (Khan, 2017). This can be considered as a milestone of women's political participation of the world.

The number of women parliamentarian in Bangladesh is, now, 71. Among the women parliamentarian 50 came from reserved proportion. Most of the women law makers are elected or nominated under the banner of Awami League. It is good news that one fifth of the total law makers are women. Now concern is that their position and activities in the decision-making process is not same as their male colleagues. The box-1 gives the state of women law makers in Bangladesh.

Box-1
Women Law Makers in Bangladesh

- The Bangladesh parliament has 350 seats, including 50 women's reserved seats
- 20.3% law makers of Bangladesh are women
- Women MPs are elected from general seats

(Source: New Age, May 20, 2018 ; March 8th, 2018, www.dhakatribune.com]

Rights of Women's Parliament:

As per the legal framework women parliamentarian are entitled to enjoy the benefits equal to their male counterpart. They are supposed to get equal access to political positions and resources.
Because of having political empowerment of women, few women MPs established good examples in the arena of politics, governance and development. However, a good number of women are encountering a number of challenges inenjoying their rights. Most the women parliamentarian do not get equal rights as male MPs because of the following reasons:

(i) Deep rooted patriarchal and masculine culture determine the role and responsibilities of women. According to the social determination, 'involvement in politics' is considered as a job of man. Thus, women remain excluded from the political world.

(ii) 'Money', 'mussel' and 'marketing' (!)are dominating features of political culture of South Asia, including Bangladesh. Since women do not have the 3Ms, they do not have good positions in 'politics'.

(iii) A good number of initiatives have been taken by Sheikh Hasina to make women friendly political culture in Bangladesh. Further initiatives are needed to institutionalise these initiatives in party politics. Without having women's strong footing in party politics, their voice may not be reflected in parliament because party politics determines women's position in parliament.

Responsibilities of Women Parliament:

Women are supposed to perform three types of responsibilities: a) law making activities, b) development activities & c) advocacy for women's right. As women MPs are the representatives of women, their all activities must be focused on women's welfare. Women MPs, mostly who are reserved set MPs are not performing the three above noted activities as per the expectation because they do not have specific role and responsibilities, as per the legal provision.

In this regards, a law maker stated "We do not have any specific role to play" (Awami League lawmaker Selina Jahan Lita from Reserved Seat 1) (March 8th,

2018, www.dhakatribune.com]. Apart from the gender bias, lack of proper resource allocation is another factor that create hindrance in the ways of political participation. A parliamentarian's voice reflects the reality,

"Reserved seat MPs have to work at the upazila-level, with an MP sometimes covering as many as 12 upazilas at once. We get a lump sum, while the elected MPs receive three times the size of the allocation we receive" (Awami League lawmaker Selina Akhter Banu from Reserved Seat 7)[Source : March 8th, 2018, www.dhakatribune.com]

Conclusion:

There is no doubt that women's involvement is treated as blessing for society. Considering the importance of women's involvement in politics Bangabondhu played the pioneering role in the field of women politics. If we like to use the power of politics as the means of social welfare , political philosophy of the great leader should be recognised. In this regard, a collective effort is needed to remove the legal and social barriers that act as hindrances in the ways of women's political empowerment.

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

গ্রাহক হতে চাইলে
যোগাযোগ করুন :
০১৯২৬৬৭৭৫৪৩
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন
www.theparliamentfacebd.com

The parliament face
A journal towards people

SUBSCRIPTION FORM

ডাক যোগে ঘরে বসে আপনাদের পছন্দ সংখ্যা পেতে

প্রিয় সম্পাদক,

আমি ডাক যোগে ঘরে বসে আপনাদের মাসিক দ্য পার্লামেন্ট ফেইস এর প্রতি সংখ্যার সংখ্যাটি নিয়মিত পেতে চাই তাই সাবস্ক্রিপশন বাবদ .... সংখ্যার জন্য .... টাকা ক্যাশ / মোবাইল ব্যাংকিং / ব্যাংক ট্রান্সফার মারফত পাঠালাম।

দয়া করে আমার নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপনাদের মাসিক দ্য পার্লামেন্ট ফেইস এর প্রতি সংখ্যার সংখ্যাটি নিয়মিত পাঠাইলে বাধিত হব।

নাম ঃ

প্রযত্নে ঃ

ঠিকানা ঃ

ফোন নম্বর ঃ

ই-মেইল ঃ

ব্যাংকের এর জন্য

ব্যাংকের নাম ঃ ....

চেক নম্বর ঃ ....

টাকার পরিমান ঃ ....

তারিখ ঃ ....

মোবাইল ব্যাংকিং এর জন্য

মোবাইল ব্যাংকিং নাম ঃ ....

পিন নম্বর ঃ ....

টাকার পরিমান ঃ ....

তারিখ ঃ ....

ব্যাংক একাউন্টের বিবরন

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস, ব্যাংক এশিয়া, একাউন্ট নং ঃ ০৮৩৩৩০০০২৯২

পাঠিয়ে দিন নিম্নলিখিত ঠিকানায়

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

৪০৪, গোলাম রসুল প্লাজা (১ম তলা)
ফ্ল্যাট এ/৪, দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন
রমনা, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ
ফোনালাপ ঃ ০১৯২৬৬৭৭৫৪৩
ইমেইল ঃ info@heparliamentfacebd.com
ওয়েব ঃ www.theparliamentfacebd.com

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ

স্মৃতি চক্রবর্তী

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সংস্কৃতিরও উন্নতি ঘটে। এর ফলে কিছুই আর আগের অবস্থায় থাকে না। বহু আগে আরব দেশে কন্যাসন্তান জন্মলাভ করলে মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো। বর্তমানে নারীদের রক্ষার জন্য সেসব দেশে বিভিন্ন আইন হচ্ছে। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারীবাদী সংগঠনগুলোর দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। আশানুরূপ না হলেও এ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় কিছু স্বীকৃতিও মিলেছে।

বর্তমানে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়ের মধ্যে প্রধান একটি বিষয় হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে– সমন্বিত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি। সমন্বিত উন্নয়নতত্ত্বের মূল দর্শন হচ্ছে– পরিবার ও সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হলো নারীর উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল দর্শন হচ্ছে– যে বিষয়গুলো নারীর অধস্তনতা সৃষ্টি করে, সে বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলা। নারীর ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন, নারীর সুপ্ত প্রতিভা এবং সম্ভাবনার বিকাশের সুযোগ, তার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সিদ্ধান্তগুলোর অংশ নিয়ে নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি।

স্থানীয় সরকারের প্রায় সব কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, এটি সত্য বটে; কিন্তু ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মাত্রা অর্জন কতটা সম্ভব হয়েছে– এটি এখনও প্রশ্নের বিষয়।

তৃণমূলে নারীর ক্ষমতায়নের চাকা গতিশীল করতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নে আমরা তখনই কাঙ্ক্ষিত মাত্রা স্পর্শ করতে পারব, যদি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো ইতিবাচক ও গঠনমূলক রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা শানিত করে।

বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকার অংশে অনুচ্ছেদ ২৮ দফার ২-এ বলা আছে, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৫-এ নারীর সমঅধিকার এবং তাদের কন্যাগুির অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। নারীর জন্য যে নতুন উন্নয়নের মডেলের বিষয়ে আলোচনা চলছে, সেখানে নারীর ক্ষমতায়নসহ মহলত মোটাদাগে চারটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো– নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নারীর মালিকানা, মানসম্মত কাজের পরিবেশ এবং মজুরি, শান্তি ও ন্যায়বিচার কিংবা ন্যায্যতা।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়া দেশের প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়– এ উপলব্ধি থেকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ জারি করে। ওই আদেশে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের

সব কমিটিতে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বড় বড় রাজনৈতিক দল তাদের কমিটিতে তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করে এবং এরই ধারাবাহিকতায় ওই দলগুলো ইতিবাচক কাজও করেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তৃণমহূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মাত্রার পহূর্ণতা লাভ করছে না কেন? স্থানীয় সরকার কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের দিকে তাকালে আমরা যা দেখতে পাই, এর পরিপ্রেক্ষিতে এমন প্রশ্নই দাঁড়ায়। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে সংরক্ষিত আসনে যারা অধিষ্ঠিত, তাদের অবস্থা অনেকটা যেন 'ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দারের মতো'। কিন্তু এটি মনে রাখা দরকার, নারীর অধিকার মানবাধিকার থেকে ভিন্ন কিছু নয়। মানবাধিকারের সব বিষয়ই নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাংলাদেশের নারীদের শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি বিশ্বের বিভিন্ড দেশে মডেল হিসেবে নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, দেশে যৌতুক, বাল্যবিয়ে, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে অনেক ভালো আইন থাকলেও তা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এ আইনগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিদের এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে সত্যিকার অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন কখনও সম্ভব নয়।

পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে পুরুষের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি এবং পরিবার থেকেই নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। ২০১৬ সালের ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদে মাত্র ২৯ জন চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী হয়েছেন। অন্য এক তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, ১৯৯৭ সালের ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যানে পদে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১১০ জন, জয়লাভ করেছিলেন ২৩ জন। ২০১৪ সালে ৪৫৮ ইউপি নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল এক হাজার ৫৬০ জন। এর আগের পাঁচ বছরের চিত্র পর্যালোচনা ক্রমে দেখা গেছে, নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কমেছে ৪৮ শতাংশ।

অন্যদিকে, জাতীয় সংসদে সংরক্ষণ পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচন এবং প্রত্যেক সাংসদের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা না থাকায় রাজনৈতিক চর্চা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে নারী নেতৃত্ব। সংরক্ষিত নারী আসনের নারীরা জনগণের কাছ থেকে দায়বদ্ধতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং বিষয়টিও বহুলভাবে সমাজে আলোচনায় এসেছে।

চাকরির ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের আনুপাতিক হার বাড়ছে। এক সমীক্ষায় প্রকাশ, প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ২২ লাখ কর্মক্ষম মানুষ শ্রমশক্তিতে যুক্ত হচ্ছেন, যার মধ্যে নারীর আনুপাতিক হার আগের চেয়ে কিছুটা সন্তোষজনক।

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন তখনই পুরোপুরি সম্ভব হবে, যখন কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ থাকবে। সেটা ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ পর্যায়ে হতে পারে। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন মোটামুটি হলেও এর পহূর্ণতা লাভের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা এখনও বিদ্যমান। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো বেশির ভাগই সামাজিক ও রাজনৈতিক। এর নিরসন না করে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন আশানুহৃপ করা সম্ভব হবে না।

নিউজ ডেস্ক

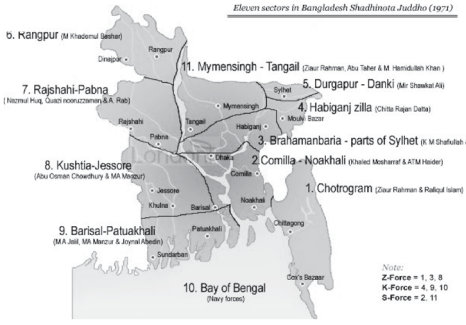

বর্তমান বাংলাদেশ নামক ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের ভূ-খন্ডটিকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর

১ নম্বর সেক্টর: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলার মুহুরী নদীর পূর্বাংশের সমগ্র এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই সেক্টরটি যার সদরদপ্তর ছিল হরিনাথে। ১ নম্বর সেক্টরের অধীনে ৫টি সাব-সেক্টর ছিল

ক) ঋষিমুখ: যার দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন শামসুল ইসলাম;

খ) শ্রীনগর: দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ও ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান;

গ) মনুঘাট: যার দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান;

ঘ) তবলছড়ি: যার দায়িত্বে ছিলেন সুবেদার আলী হোসেন এবং

ঙ) ডিগাগিরি: এই সাব সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন জনৈক সুবেদার।

২ নম্বর সেক্টর: ঢাকা, কুমিলা, ফরিদপুর ও নোয়াখালী জেলার অংশ নিয়ে ২ নম্বর সেক্টর গঠিত হয়েছিলো যার সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্বে ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ এবং মেজর এ. টি. এম হায়দার। এর অধীনে ৬টি সাব সেক্টর ছিলো।

ক) গঙ্গাসাগর, আখাউড়া ও কসবা অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন মাহবুব, লেফটেন্যান্ট ফারুক ও লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবীর;

খ) মন্দভাব: দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আব্দুল হামিদ;
গ) শালদা নদী: দায়িত্বে ছিলেন মাহমুদ হাসান;
ঘ) মতিনগর: দায়িত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট দিদারুল আলম;
ঙ) নির্ভয়পুর: দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আকবর ও লেফটেন্যান্ট মাহবুব;
চ) রাজনগর: ক্যাপ্টেন জাফর উমাম, ক্যাপ্টেন শহীদ ও লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান।

৩ নম্বর সেক্টর: উত্তরে সিলেটের ছড়ামণকাঠি শ্রীমঙ্গলের নিকট এবং দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শিঙ্গার বিল পর্যন্ত এলাকা নিয়ে ৩ নম্বর সেক্টর গঠিত হয়েছিলো। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর কে এম শফিউল্লাহ এবং মেজর এ এন এম নূরুজ্জামান। এই সেক্টরের অধীনে সাব সেক্টর ছিলো ১০টি যেমন:
ক) আশ্রমবাড়ি, যার দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আজিজ ও ক্যাপ্টে এজাজ;
খ) বাঘাইবাড়ি যার দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আজিজ ও ক্যাপ্টেন এজাজ;
গ) হাতকাটা, যার দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান;
ঘ) সিমলা, যার দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিন;
ঙ) পঞ্চবাটি, যার দায়িদ্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন নাসিম;
চ) মনতলা, যার দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন এম এস এ ভুঁইয়া;
ছ) বিজয়নগর, যার দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন এম এস এ ভুঁইয়া;
জ) কালাছাড়া, যার দায়িত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট মজুমদার;
ঝ) কলকলিয়া, যার দায়িত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট গোলাম হেলাল মোরশেদ এবং
ঞ) বামুটিয়া: যার দায়িত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট সাঈদ।

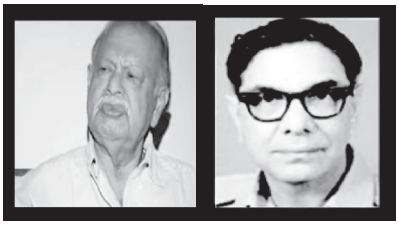

৪ নম্বর সেক্টর: উত্তরে সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা থেকে দক্ষিণে কানাইঘাট পুলিশ স্টেশন পর্যন্ত দশ মাইল বিস্তৃত সীমান্ত এলাকা নিয়ে ৪ নম্বর সেক্টর গঠিত হয়েছিলো যার সদর দপ্তর ছিলো প্রথমে করিমগঞ্জ এবং পরে মাছিমপুরে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর চিত্ত রঞ্জন দত্ত এবং ক্যাপ্টেন এ রব। এর অধীনে ৬টি সাব সেক্টর ছিলো যেমন ক) জামালপুর: মাহবুব রব শাদী;
খ) বড়পুঞ্জি: ক্যাপ্টেন এ রব ও লেফটেন্যান্ট আমীরুল হক চৌধুরী;
গ) আমলাসিদ: লেফটেন্যান্ট জহির;
ঘ) কুকিতল: ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের ও ক্যাপ্টেন শরিফুল হক;
ঙ) কৈলাশ শহর: লেফটেন্যান্ট উয়াকিউজ্জামান ও ফজলুল হক চৌধুরী; চ) কমলপুর: ক্যাপ্টেন এনাম।

৫ নম্বর সেক্টর: সিলেট জেলার দূর্গাপুর থেকে ডাউকি তামাবিল এবং পূর্বসীমা পর্যন্ত এলাকা নিয়ে ৫ নম্বর সেক্টর গঠিত হয়েছিলো যার সদরদপ্তর ছিলো বাঁশতলাতে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। এই সেক্টরের অধীনে ৬টি সাব সেক্টর ছিলো যেমন: ক) মুক্তাপুর: ক্যাপ্টেন কাজী ফারুক আহমেদ, সুবেদার মুজিবর রহমান ও নায়েব সুবেদার নজির হোসেন;
খ) ডাউকী: সুবেদার মেজর বি আর চৌধুরী;
গ) শেলা: ক্যাপ্টেন হেলাল, সহযোগী কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মাহবুবুর রহমান ও লেফটেন্যান্ট আবদরি রউফ;
ঘ) ভোলাগঞ্জ: লেফটেন্যান্ট তাহের উদ্দিন আখঞ্জী ও সহযোগী কমান্ডার লেফটেন্যান্ট এস এম খালেদ;
ঙ) বালাট: সার্জেন্ট গনি, ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন ও এনামুল হক চৌধুরী এবং
চ) বড়ছড়া: ক্যাপ্টেন মুসলিম উদ্দিন।

৬ নম্বর সেক্টর: রংপুর জেলা এবং দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে ৬ নম্বর সেক্টর গঠিত হয়েছিলে,া যাপ সদরদপ্তর ছিলো পাটগ্রামের নিকট বুড়িমারিতে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন উইং কমান্ডার এম কে বাশার। এই সেক্টরের অধীনে ৬টি সাব সেক্টর ছিলো যেমন:

ক) ভজনপুর: ক্যাপ্টেন নজরুল, স্কোয়াড্রন লীডার সদর উদ্দিন ও ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার;
খ) পাটগ্রাম: ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান;
গ) সাহেবগঞ্জ: নওয়াজেশ উদ্দিন;
ঘ) ফুলবাড়ী কুড়িগ্রাম: ক্যাপ্টেন আবুল হোসাইন; মোঘলহাট: ক্যাপ্টেন দেলওয়ার এবং
ঙ) চিলাহাটি: ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল।

৭ নম্বর সেক্টর: রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে ৭ নম্বর সেক্টর গঠিত হয়েছিলো যার সদরদপ্তর ছিলো তরঙ্গতে। এই সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর নাজমুল হক, সুবেদার মেজর এ রব ও মেজর কাজী নুরুজ্জামান। এই সেক্টরের অধীনে ৮টি সাব সেক্টর

ছিলো যেমন:
ক) মালন: ই পি আর জে সি ও গন এবং ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর;
খ) তপন: মেজর নাজমুল হক ও ই পি আর জে সি ও গন;
গ) মেহেদীপুর: সুবেদার ইলিয়াস ও ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর;
ঘ) হামজাপুর: ক্যাপ্টেন ইদ্রিস;
ঙ) আঙ্গিনাবাদ: জনৈক গণবাহিনীর সদস্যগণ;
চ) শেখপাড়া: ক্যাপ্টেন রশীদ;
ছ) ঠোকড়াবাড়ী: সুবেদার মোয়াজ্জেম এবং লালগোলা: ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী।

৮ নম্বর সেক্টর: এপ্রিল মাসে এই সেক্টরের অপারেশনাল এলাকা ছিল কুষ্টিয়া, যশোর খুলনা বরিশাল ফরিদপুর ও পটুয়াখালী জেলা, মে মাসের শেষে অপারেশনাল এলাকা সংকুচিত করে কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলা সদর, সাতক্ষীরা মহকুমা এবং ফরিদপুরের উত্তরাংশ নিয়ে ৮ নম্বর সেক্টর গঠিত হয়েছিলো, যার সদরদপ্তর বেনাপোলে থাকলেও কার্যত সদরদপ্তরের একটা বিরাট অংশ ছিলো ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী শহরে। এই সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ও মেজর এম এ মঞ্জুর। এই সেক্টরের অধীনে ৭টি সাব-সেক্টর ছিলো যেমন:
ক) বয়রা: খোন্দকার নাজমুল হুদা;
খ) হাকিমপুর: ক্যাপ্টেন শফিক উদ্দিন;
গ) ভোমরা: ক্যাপ্টেন সালাহ উদ্দিন ও ক্যাপ্টেন সাহাব উদ্দিন;
ঘ) লালবাজার: ক্যাপ্টেন এ আর আযম চৌধুরী;
ঙ) বানপুর: ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান;
চ) বেনাপোল: ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম ও ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী এবং
ছ) শিকারপুর: ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী ও লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর।

৯ নম্বর সেক্টর: বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা এবং খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে ৯ নম্বর সেক্টর গঠিত হয়েছিল।

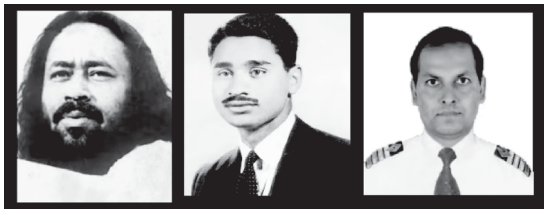

এই সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মেজর এম এ জলিল, মেজর এম এ মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এবং মেজর জয়নাল আবেদীন। এই সেক্টরের অধীনে ৩টি সাব-সেক্টও ছিলো যথা:
ক) টাকি;
খ) হিঙ্গলগঞ্জ এবং
গ) শমসেরনগর।

১০ নম্বর সেক্টর: এই সেক্টরটি নৌ-কমান্ডো দিয়ে গঠিত হয়েছিলো, যার সদরদপ্তর ছিলো কমান্ডো সদর দপ্তর বাংলাদেশ বাহিনী। এই সেক্টরের কোন সাব-সেক্টর ছিল না।

১১ নম্বর সেক্টর: ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর, গাইবান্ধা, উলিপুর, কামালপুর ও চিলমারীর অংশ নিয়ে ১১ নম্বর সেক্টর গঠিত হয়েছিল, যার সদর দপ্তর ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত ছিলো তেলধলা তারপর মাহেন্দ্রগঞ্জে স্থানান্তর করা হয়। এই সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর আবু তাহের ও স্কোয়াড্রন লিডার এম হামিদুল্লাহ খান। এই সেক্টরের অধীনে ৮টি সাব-সেক্টর

ছিল। যথা:
ক) মানখারচর: স্কোয়াড্রন লিডার এম হামিদুল্লাহ খান;
খ) মাহেন্দ্রগঞ্জ: মেজর আবু তাহের;
গ) পুরাখাশিয়া: লেফটেন্যান্ট হাসেম;
ঘ) ডালু: লেফটেন্যান্ট তাহের ও লেফটেন্যান্ট কামাল;
ঙ) রাংরা: মতিউর রহমান;
চ) শিববাড়ী: জুনিয়র কমিশনার অফিসার ই পি আর;
ছ) বাঘমারা: জুনিয়র কমিশনার অফিসার ই পি আর এবং
জ) মহেশখোলা: ই পি আর সদস্য।

সম্মানে স্মরণে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাগণ

সাগরসম রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ একেবারেই সরলপথে আসেনি। বিভিন্ন কৌশলে যুদ্ধ করতে হয়েছে, যুদ্ধের পরিকল্পনা করা ও সেক্টর অনুযায়ী যোদ্ধা তৈরী করা সবই কঠিন পরিকল্পনা এবং লৌহ কঠিন ছিল সেটা বাস্তবায়ন। সেই রক্তঝরা অম্লান স্মৃতিস্নাত মুক্তিযুদ্ধ সময়কালে যোদ্ধা সংঘঠিত করা, প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি পরিচালনা, সম্মুখযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া এবং সর্বপরি যুদ্ধজয়ের বরমাল্য সমেত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এদেশের আপামর কৃষক-শ্রমিক-জেলে-মুজুরসহ মুক্তিকামী ছাত্রসমাজ-শিক্ষক সমাজ থেকে সৈনিক সমাজ পর্যন্ত সকল শ্রেণী পেশার মানুষ নিবেদিত প্রাণে আত্মত্যাগের মহিমায় এককাতারে দাঁড়িয়েছিল। গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাশক্তি, মুক্তিকামী মানুষের অসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-এর সংগ্রামী চেতনা ধারণ করে এদেশের নিরস্ত্র জনগন সসজ্জিত পাকহানাদার শক্তিকে পরাজিত করে বিশ্বগগনে উড়িঁয়েছিল লাল সবুজের পতাকা। মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মৎসর্গ ও নিবেদিতপ্রাণকে সসম্মানে ভুষিত করতে ভুল করেননি বঙ্গবন্ধু। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রাপ্যতানুযায়ী পদকে সম্মানিত করেছেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য চারটি ক্যাটাগরিতে সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের খেতাব দেয়া হয়। ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ গেজেটের একটি অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিঞ্জপ্তির মাধ্যমে এই পদকপ্রাপ্তদের নাম ঘোষনা করা হয়। গুরুত্বানুসারে বীরত্বের জন্য মুক্তিযুদ্ধেও সম্মুখ যোদ্ধাদের এই পদকে ভুষিত করা হয়।

যেমন:

ক) বীরশ্রেষ্ঠ
খ) বীর উত্তম
গ) বীর বিক্রম এবং
ঘ) বীর প্রতীক।

ক) বীর শ্রেষ্ঠ:

এটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সামরিক পদক। যুদ্ধক্ষেত্রে অতুলনীয় সাহস ও আত্মত্যাগের নিদর্শন স্থাপনকারী যোদ্ধার স্বীকৃতি স্বরুপ এই পদক দেয়া হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ সাতজন বীরমুক্তিযোদ্ধাকে এই পদক দেয়া হয়েছে।

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর
সেক্টর - বাংলাদেশ সেনা বাহিনী
পদক - বীরশ্রেষ্ঠ
পদবী - ক্যাপ্টেন
গ্যাজেট নম্বর - ০১
জন্ম তারিখ-৭ মার্চ ১৯৪৯
মৃত্যু- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এইচ, এস, সি
ঠিকানা : গ্রাম- রহিমগঞ্জ, ডাকঘর-বাবুগঞ্জ, বরিশাল।

মোস্তফা কামাল
সেক্টর - বাংলাদেশ সেনা বাহিনী
পদক - বীরশ্রেষ্ঠ
পদবী - সিপাহী
গ্যাজেট নম্বর - ০৩
জন্ম তারিখ- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭
মৃত্যু- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এস, এস, সি
ঠিকানা : গ্রাম- পশ্চিম হাজীপুর, ডাকঘর-দৌলতখান, ভোলা।

মতিউর রহমান
সেক্টর - বাংলাদেশ সেনা বাহিনী
পদক - বীরশ্রেষ্ঠ
পদবী - ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
গ্যাজেট নম্বর - ০৫
জন্ম তারিখ- ২৯ অক্টোবর ১৯৪১
মৃত্যু- ২০ আগস্ট ১৯৭১
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এস, এস, সি
ঠিকানা : ১০৯, আগা সাদেক রোডের "মোবারক লজ", পুরান ঢাকা।

নূর মোহাম্মদ শেখ
সেক্টর - বাংলাদেশ রাইফেলস
পদক - বীরশ্রেষ্ঠ
পদবী - ল্যান্স নায়েক
গ্যাজেট নম্বর - ০৭
জন্ম তারিখ- ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬
মৃত্যু- ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
শিক্ষাগত যোগ্যতা- সপ্তম
ঠিকানা : গ্রাম- মহিষখোলা, নড়াইল।

হামিদুর রহমান
সেক্টর - বাংলাদেশ সেনা বাহিনী
পদক - বীরশ্রেষ্ঠ
পদবী - সিপাহী
গ্যাজেট নম্বর - ০২
জন্ম তারিখ- ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩
মৃত্যু- ২৮ অক্টোবর ১৯৭১
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এস, এস, সি
ঠিকানা : গ্রাম- খর্দ্দ খালিশপুর, ডাকঘর-মহেশপুর, যশোর।

মোহাম্মদ রুহুল আমিন
সেক্টর- বাংলাদেশ সেনা বাহিনী
পদক - বীরশ্রেষ্ঠ
পদবী - ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার
গ্যাজেট নম্বর - ০৪
জন্ম তারিখ- ১৯৩৫
মৃত্যু- ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এস, এস, সি
ঠিকানা : গ্রাম- বাঘপাঁচড়া, ডাকঘর-সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী।

মুন্সি আব্দুর রউফ
সেক্টর- বাংলাদেশ রাইফেলস
পদক - বীরশ্রেষ্ঠ
পদবী - ল্যান্স নায়েক
গ্যাজেট নম্বর - ০৬
জন্ম তারিখ- ১ মে ১৯৪৩
মৃত্যু- ৮ এপ্রিল ১৯৭১
শিক্ষাগত যোগ্যতা- হাতেখড়ি
ঠিকানা : গ্রাম- সালামতপুর, ডাকঘর- মধুখালী, ফরিদপুর।

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা

খ) বীর উত্তম:

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন বীর উত্তম তাদের মধ্যে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বীরত্বের খেতাব। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ৬৮জনকে এই উপাধিতে ভুষিত করা হয়। সর্বশেষ বীর উত্তম খেতাব পেয়েছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ঝামিল আহমেদ (২০১০) মরণোত্তরসহ সর্বমোট বীর উত্তম ৬৯জন।

আবদুর রব
পদক - বীর উত্তম
পদবী - মেজর জেনারেল
গ্যাজেট নম্বর - ০৮
জন্ম তারিখ- ১৯১৯
মৃত্যু- ১৪ নভেম্বর ১৯৭৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এস, এস, সি
ঠিকানা : গ্রাম- কুর্শা-খাগাউড়া, ডাকঘর- বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

কাজী মুহাম্মদ সফিউলাহ
সেক্টর - অধিনায়ক, এস. ফোর্স
পদক - বীর উত্তম
পদবী - মেজর জেনারেল
গ্যাজেট নম্বর - ০৯
জন্ম তারিখ- ২সেপ্টেম্বর ১৯৩৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা- পি, এস, সি
ঠিকানা : গ্রাম- রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

জিয়াউর রহমান
সেক্টর - অধিনায়ক, জেড. ফোর্স
পদক - বীর উত্তম
পদবী - লে. জেনারেল
গ্যাজেট নম্বর - ১০
জন্ম তারিখ- ১৯ জানুয়ারি ১৯৩৬
মৃত্যু- মে ৩০, ১৯৮১
শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক
ঠিকানা : গ্রাম- বাগানবাড়ী, বগুড়া।

চিত্ত রঞ্জন দত্ত
সেক্টর - অধিনায়ক ৪
পদক - বীর উত্তম
পদবী - মেজর জেনারেল
গ্যাজেট নম্বর - ১১
জন্ম তারিখ- ১ জানয়ারি ১৯২৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বি.এস.সি
ঠিকানা : গ্রাম- শিলয়ে, আসাম।

কাজী নূরুজ্জামান
সেক্টর - অধিনায়ক ৭
পদক - বীর উত্তম
পদবী - লে. কর্ণেল
গ্যাজেট নম্বর - ১২
জন্ম তারিখ- ২৪ মার্চ ১৯২৫
মৃত্যু- ৬ মে ২০১১
শিক্ষা: সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে

মীর শওকত আলী
সেক্টর - অধিনায়ক ৫
পদক - বীর উত্তম
পদবী - লে. জেনারেল
গ্যাজেট নম্বর - ১৩
জন্ম তারিখ- ১১ জানয়ারী ১৯৩৮
মৃত্যু- ২০ নভেম্বর, ২০১০
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এইচ.এস.সি
ঠিকানা: নাজিরা বাজারের আগাসাদেক রোডে, পুরনো ঢাকা।

খালেদ মোশাররফ
সেক্টর - অধিনায়ক কে. ফোর্স
পদক - বীর উত্তম
পদবী - ব্রিগেডিয়ার
গ্যাজেট নম্বর - ১৪
জন্ম তারিখ- ১ নভেম্বর ১৯৩৭
মৃত্যু- ৭ নভেম্বর ১৯৭৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এইচ.এস.সি
ঠিকানা: মোশাররফগঞ্জ, থানা- ইসলামপুর থানা, জামালপুর।

মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর
সেক্টর- অধিনায়ক ৮
পদক - বীর উত্তম
পদবী - মেজর জেনারেল
গ্যাজেট নম্বর - ১৫
জন্ম তারিখ- ১৯৪০
শিক্ষাগত যোগ্যতা- আইএসসি
মৃত্যু- জুন ২, ১৯৮১
ঠিকানা: গুপিনাথপুর, থানা- কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

এ. এন. এম. নূরুজ্জামান
সেক্টর- অধিনায়ক ৩
পদক - বীর উত্তম
পদবী - লে. কর্ণেল
গ্যাজেট নম্বর - ১৭
জন্ম তারিখ- ১৯৩৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক
মৃত্যু- ১৬ মার্চ ১৯৯৩
ঠিকানা: সায়দাবাদ, থানা- রায়পুরা, নরসিংদী।

আবদুস সালেক চৌধুরী
সেক্টর- অধিনায়ক ২
পদক - বীর উত্তম
পদবী - মেজর
গ্যাজেট নম্বর - ১৯
জন্ম তারিখ- ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬
মৃত্যু- ১৯ নভেম্বর, ১৯৭২
ঠিকানা: হাতুরপাড়া, উপজেলা- দোহার, ঢাকা।

খাজা নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া
সেক্টর - ৪
পদক - বীর উত্তম
পদবী - লিডার গণবাহিনী
গ্যাজেট নম্বর - ২১
জন্ম তারিখ - ১৯ ফেব্রয়ারি, ১৯৪৯
মৃত্যু - ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর
ঠিকানা: মালাপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া।

এ.টি.এম. হায়দার
সেক্টর - অধিনায়ক ২
পদক - বীর উত্তম
পদবী - লে. কর্ণেল
গ্যাজেট নম্বর - ২৩
জন্ম তারিখ - ১২ জানয়ারি, ১৯৪২
মৃত্যু - ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাস্টার্স
ঠিকানা: ভবানীপুর, কলকাতা।

মোহাম্মদ আবু তাহের
সেক্টর - অধিনায়ক ১১
পদক - বীর উত্তম
পদবী - লে. কর্ণেল
গ্যাজেট নম্বর - ১৬
জন্ম তারিখ- ১৪ নভেম্বর ১৯৩৮
মৃত্যু- ২১ জুলাই ১৯৭৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক
ঠিকানা: বাদারপুর, আসাম।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
সেক্টর- অধিনায়ক ১
পদক - বীর উত্তম
পদবী - মেজর
গ্যাজেট নম্বর - ১৮
জন্ম তারিখ- ১৯৪৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক
ঠিকানা: নাওড়া, থানা- শাহরাস্তি, চাঁদপুর।

এ জে এম আমিনুল হক
সেক্টর- অধিনায়ক ৮, ইস্ট বেঙ্গল
পদক - বীর উত্তম
পদবী - ব্রিগেডিয়ার
গ্যাজেট নম্বর - ২০
জন্ম তারিখ- অজানা
মৃত্যু- ২০১১
ঠিকানা: গ্রাম-বাঁশবাড়িয়া, উপজেলা- টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

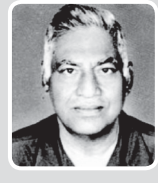

হারুন আহমেদ চৌধুরী
সেক্টর - ১
পদক - বীর উত্তম
পদবী - মেজর জেনারেল
গ্যাজেট নম্বর - ২২
জন্ম তারিখ -৬ নভেম্বর ১৯৪৫
ঠিকানা: সিলেট।

মোহাম্মদ আবদুল গাফফার হালদার
সেক্টর - অধিনায়ক ৯ইস্ট বেঙ্গল
পদক - বীর উত্তম
পদবী - লে. কর্ণেল
গ্যাজেট নম্বর - ২৪
জন্ম তারিখ - অজানা
ঠিকানা: গ্রাম: আরাজি-সাজিয়ারা, উপজেলা- ডুমুরিয়া, খুলনা।

মো. শরীফুল হক ডালিম
সেক্টর - ৪
পদক - বীর উত্তম
পদবী - লে. কর্ণেল
গ্যাজেট নম্বর - ২৫
জন্ম তারিখ- ১৯৪৬

মোহাম্মদ শাহজাহান ওমর
সেক্টর - ৯
পদক - বীর উত্তম
পদবী - মেজর
গ্যাজেট নম্বর - ২৬
জন্ম তারিখ- অজানা
ঠিকানা: গ্রাম- সাংগর, উপজেলা- রাজাপুর, ঝালকাঠি ।

মাহবুবুর রহমান
সেক্টর - জেডফোর্স
পদক - বীর উত্তম
পদবী - ক্যাপ্টেন
গ্যাজেট নম্বর - ৩০
জন্ম তারিখ- অজানা
মৃত্যু- ১৯৭১
ঠিকানা: গ্রাম- ঈদগাহবস্তি, দিনাজপুর ।

জিয়াউদ্দিন আহমেদ
সেক্টর- অধিনায়ক ১মইস্টবেঙ্গল
পদক - বীর উত্তম
পদবী - লে. কর্ণেল
গ্যাজেট নম্বর - ২৮
ঠিকানা: পিরোজপুর।

আফতাবুল কাদের
সেক্টর- ১
পদক - বীর উত্তম
পদবী - ক্যাপ্টেন
গ্যাজেট নম্বর - ২৯
জন্ম তারিখ- ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৭
মৃত্যু- ২৭ এপ্রিল, ১৯৭১
ঠিকানা: গ্রাম-পিউরি, উপজেলা- রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।

সালাহউদ্দিন মমতাজ
সেক্টর- ১ম ইস্টবেঙ্গল
পদক - বীর উত্তম
পদবী - ক্যাপ্টেন
গ্যাজেট নম্বর - ৩১
জন্ম তারিখ- ১৯৪৫
মৃত্যু- ৩১ জুলাই, ১৯৭১
ঠিকানা: গ্রাম-উত্তর চাড়িপুর, উপজেলা- সদর, ফেনী।

মোহাম্মদ আজিজুর রহমান
সেক্টর- ২য় ইস্টবেঙ্গল
পদক - বীর উত্তম
পদবী - মেজর জেনারেল
গ্যাজেট নম্বর - ৩২
জন্ম তারিখ- অজানা
ঠিকানা: উপজেলা- গোলাপগঞ্জ, সিলেট ।

এস এম ইমদাদুল হক
সেক্টর- ৮ম ইস্টবেঙ্গল
পদক - বীর উত্তম
পদবী - লেফটেন্যান্ট
গ্যাজেট নম্বর - ৩৩
জন্ম তারিখ- ১৯৪৬
মৃত্যু- ৩১ জুলাই, ১৯৭১
ঠিকানা: গ্রাম- মাটলা , উপজেলা- সদর, গোপালগঞ্জ।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
সেক্টর- ১ম ইস্টবেঙ্গল
পদক - বীর উত্তম
পদবী - লেফটেন্যান্ট
গ্যাজেট নম্বর - ৩৪
জন্ম তারিখ- ৫ মে, ১৯৪৭
মৃত্যু- ১৯৭১
ঠিকানা: গ্রাম- সোনাইমুড়ি , উপজেলা- শাহরাস্তি, চাঁদপুর।

আবু মঈন মোহাম্মদ আশফাকুস সামাদ
সেক্টর - ৬
পদক - বীর উত্তম
পদবী - লেফটেন্যান্ট
গ্যাজেট নম্বর - ৩৫
জন্ম তারিখ - ১২ জানয়ারি, ১৯৪২
মৃত্যু - ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বিএ
ঠিকানা: সতেরো দরিয়া, উপজেলা- করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ।

আফতাব আলী
পদক - বীর উত্তম
পদবী - ক্যাপ্টেন
গ্যাজেট নম্বর - ৩৬
জন্ম তারিখ- ১ ডিসেম্বর, ১৯২৫
ঠিকানা: গ্রাম- ভাদেশ্বর দক্ষিণভাগ, উপজেলা- গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

ফয়েজ আহমদ
সেক্টর - অধিনায়ক ১১
পদক - বীর উত্তম
পদবী - সুবেদার
গ্যাজেট নম্বর - ৩৭
জন্ম তারিখ- ১৯৪০
মৃত্যু- ১৯৭১
ঠিকানা: গ্রাম- অলকা, উপজেলা- পরশুরাম, ফেনী।

বেলায়েত হোসেন
পদক - বীর উত্তম
পদবী - নায়েব সুবেদার
গ্যাজেট নম্বর - ৩৮
জন্ম তারিখ- অজানা
মৃত্যু- নভেম্বর ১৪, ১৯৭১
ঠিকানা: গাছুয়া, উপজেলা- সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

মঈনুল হোসেন
পদক - বীর উত্তম
পদবী - নায়েব সুবেদার
গ্যাজেট নম্বর - ৩৯
জন্ম তারিখ- অজানা
মৃত্যু- ১৯৭১
ঠিকানা: কুসুমপুর, উপজেলা- বুড়িচং, কুমিল্লা।

হাবিবুর রহমান
পদক - বীর উত্তম
পদবী - নায়েব সুবেদার
গ্যাজেট নম্বর - ৪০
জন্ম তারিখ- অজানা
ঠিকানা: মৈন্দ, উপজেলা- সদর , ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

শাহে আলম
পদক - বীর উত্তম
পদবী - হাবিলদার
গ্যাজেট নম্বর - ৪১
জন্ম তারিখ- অজানা
মৃত্যু- ১৯৭১
ঠিকানা: গ্রাম- দিদারুল্যাহ, উপজেলা- দৌলতখান, ভোলা।

মোহাম্মদ নুরুল আমিন
পদক - বীর উত্তম
পদবী - ক্যাপ্টেন
গ্যাজেট নম্বর - ৪২
জন্ম তারিখ - ১৯ ফেব্রয়ারি, ১৯৪৯
মৃত্যু - ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
ঠিকানা: গ্রাম- পাশাকোট, উপজেলা- চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা ।

নাসির উদ্দিন
পদক - বীর উত্তম
পদবী - হাবিলদার
গ্যাজেট নম্বর - ৪৩
জন্ম তারিখ - অজানা
মৃত্যু - ১৯৭১
ঠিকানা: গ্রাম- মোহাম্মদপুর, উপজেলা- সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

আবদুল মান্নান
পদক - বীর উত্তম
পদবী -
গ্যাজেট নম্বর - ৪৪
জন্ম তারিখ - ১ জানয়ারি, ১৯৪০
মৃত্যু - ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
ঠিকানা: গ্রাম- পশ্চিম ডেকরা, উপজেলা- চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা ।

আবদুল লতিফ মন্ডল
পদক - বীর উত্তম
পদবী - ল্যান্স নায়েক
গ্যাজেট নম্বর - ৪৫
জন্ম তারিখ - ১৯৪৭
মৃত্যু- ৬ নভেম্বর, ১৯৭১
ঠিকানা: গ্রাম: চরেরহাট, উপজেলা- পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

আবদুস সাত্তার
পদক - বীর উত্তম
পদবী - হাবিলদার
গ্যাজেট নম্বর - ৪৬
জন্ম তারিখ- ১০ অক্টোবর, ১৯৪৫
ঠিকানা: গ্রাম-কাশীপুরের গনপাড়া, উপজেলা-সদর, বরিশাল।

শামসুজ্জামান
সেক্টর - ৬
পদক - বীর উত্তম
পদবী - সিপাহী
গ্যাজেট নম্বর - ৪৮
জন্ম তারিখ- অজানা, মৃত্যু- ১৯৭১
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বিএ
ঠিকানা: সোনার চর, উপজেলা- মেঘনা, কুমিল্লা।

ফজলুর রহমান খন্দকার
পদক - বীর উত্তম
পদবী - সুবেদার
গ্যাজেট নম্বর - ৫০
জন্ম তারিখ- অজানা
মৃত্যু- ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
ঠিকানা: আউলিয়াপুর, উপজেলা- বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

সালাহ উদ্দিন আহমেদ
পদক - বীর উত্তম
পদবী - ডিএডি
গ্যাজেট নম্বর - ৫৪
জন্ম তারিখ -অজানা
মৃত্যু - ১৯৯৫
ঠিকানা: গ্রাম- দাসাদী, উপজেলা- সদর, চাঁদপুর ।

এরশাদ আলী
পদক - বীর উত্তম
পদবী - সিপাহী
গ্যাজেট নম্বর - ৫৬
জন্ম তারিখ - ১৯৩৫
মৃত্যু - ১৯৭১
ঠিকানা: গ্রাম- বিষ্ণবপুর, উপজেলা- সেনবাগ, নোয়াখালী

নূরুল হক
পদক - বীর উত্তম
পদবী - সিপাহী
গ্যাজেট নম্বর - ৪৭
জন্ম তারিখ- অজানা
মৃত্যু- ১৯৭১
ঠিকানা: গ্রাম- সিরাজপুর, উপজেলা- কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী ।

সাফিল মিয়া
সেক্টর - ৯ম ইস্টবেঙ্গল
পদক - বীর উত্তম
পদবী - সিপাহী
গ্যাজেট নম্বর - ৪৯
জন্ম তারিখ- অজানা
মৃত্যু- ১ অক্টোবর, ১৯৭১
ঠিকানা: রাজাপুর, উপজেলা- আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মজিবুর রহমান
পদক - বীর উত্তম
পদবী - নায়েব সুবেদার
গ্যাজেট নম্বর - ৫১
জন্ম তারিখ- অজানা
মৃত্যু- ২৪ এপ্রিল, ১৯৭১
ঠিকানা: গ্রাম- পাচুরিয়া, উপজেলা- লোহাগড়া, নড়াইল।

আনোয়ার হোসেন
পদক - বীর উত্তম
পদবী - সিপাহী
গ্যাজেট নম্বর - ৫৫
জন্ম তারিখ - অজানা
মৃত্যু - ২৬ জুলাই, ১৯৭১
ঠিকানা: গ্রাম- গোপিনাথপুর, উপজেলা- সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মোজাহার উলাহ
সেক্টর - এমএফ, সেক্টর-১
পদক - বীর উত্তম
পদবী - নৌ- কমান্ডো
গ্যাজেট নম্বর - ৫৭
জন্ম তারিখ - অজানা
মৃত্যু- ২০০৮
ঠিকানা: গ্রাম: ভালুকা, উপজেলা- মীরসরাই, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন
সেক্টর- নৌবাহিনী
পদক - বীর উত্তম
পদবী - লে. কামান্ডার
গ্যাজেট নম্বর - ৫৮
জন্ম তারিখ- অজানা
ঠিকানা: গ্রাম- পলাশবাড়িয়া, উপজেলা- মোহাম্মদপুর, মাগুরা ।

আফজাল মিয়া
সেক্টর - নৌবাহিনী
পদক - বীর উত্তম
পদবী - ইআরএ
গ্যাজেট নম্বর - ৫৯
জন্ম তারিখ- অজানা
মৃত্যু- ১৯৯১
ঠিকানা: গ্রাম- ভারারুল, উপজেলা- সদর, গাজীপুর ।

বদিউল আলম
সেক্টর - নৌবাহিনী
পদক - বীর উত্তম
পদবী - এমই-১
গ্যাজেট নম্বর - ৬০
জন্ম তারিখ- ৩০ অক্টোবর, ১৯৪৬
ঠিকানা: গ্রাম- রামপুরা, উপজেলা- গোবিন্দগঞ্জ, গগাইবান্ধা ।

সিরাজুল মওলা
সেক্টর - নৌবাহিনী
পদক - বীর উত্তম
পদবী - এবি
গ্যাজেট নম্বর - ৬১
জন্ম তারিখ- ৩০ অক্টোবর, ১৯৪৬
ঠিকানা: গ্রাম- নাওপুরা, উপজেলা- কচুয়া, চাঁদপুর।

আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী
সেক্টর - নৌবাহিনী
পদক - বীর উত্তম ও বীর বিক্রম
পদবী - কমোডোর
গ্যাজেট নম্বর - ৬২
জন্ম তারিখ- অজানা
ঠিকানা: গ্রাম- উত্তর শ্রীপুর, উপজেলা- ফুলগাজী, ফেনী।

মতিউর রহমান
সেক্টর - এমএফ
পদক - বীর উত্তম
পদবী - নৌকমান্ডো
গ্যাজেট নম্বর - ৬৩
জন্ম তারিখ- অজানা
মৃত্যু- ১৯৯৬
ঠিকানা: গ্রাম- রঘুনাথপুর, উপজেলা- দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

মোহাম্মদ শাহ আলম
সেক্টর - ১
পদক - বীর উত্তম
পদবী - নৌকমান্ডো
গ্যাজেট নম্বর - ৬৪
জন্ম তারিখ -১৯৪৬, মৃত্যু - ১৯৮৫
ঠিকানা: গ্রাম- পকরমুলাপুর, উপজেলা- বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী ।

আবদুল করিম খন্দকার
সেক্টর - বমান বাহিনী প্রধান
পদক - বীর উত্তম
পদবী - গ্রু. ক্যাপ্টেন
গ্যাজেট নম্বর - ৬৫
জন্ম তারিখ - অজানা

খাদেমুল বাশার
সক্টর - অধিনায়ক-৬
পদক - বীর উত্তম
পদবী - এয়ার ভাইস মার্শাল
গ্যাজেট নম্বর - ৬৬
জন্ম তারিখ - ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫
মৃত্যু - ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬
ঠিকানা: বগুড়া।

সুলতান মাহমুদ
সেক্টর - অধিনায়ক কিলোফ্লাইট
পদক - বীর উত্তম
পদবী - এয়ার ভাইস মার্শাল
গ্যাজেট নম্বর - ৬৭
জন্ম তারিখ - অজানা
ঠিকানা: দাগনভূঁইয়া, ফেনী।

শামসুল আলম
সেক্টর - সদরদফতর, মুজিবনগর
পদক - বীর উত্তম
পদবী - গ্রুপক্যাপ্টেন
গ্যাজেট নম্বর - ৬৮
জন্ম তারিখ- অজানা
ঠিকানা: গ্রাম- পাতিলাপাড়া, উপজেলা- বাউফল, পটুয়াখালী ।

বদরুল আলম
সেক্টর- কিলোফ্লাইট
পদক - বীর উত্তম
পদবী - স্কোয়াড্রেনলীডার
গ্যাজেট নম্বর - ৬৯
জন্ম তারিখ- অজানা
ঠিকানা: গ্রাম- চর, উপজেলা- বাড়াই, মানিকগঞ্জ।

লিয়াকত আলী খান
সেক্টর - সদরদপ্তর, জেড. ফোর্স
পদক - বীর উত্তম
পদবী - স্কোয়াড্রেন লীডার
গ্যাজেট নম্বর - ৭০
জন্ম তারিখ- অজানা
ঠিকানা: আমলাপাড়া, সরাই রোড, বাগেরহাট।

সাহাবউদ্দিন আহমেদ
সেক্টর - কিলোফ্লাইট
পদক - বীর উত্তম
পদবী - ক্যাপ্টেন
গ্যাজেট নম্বর - ৭১
জন্ম তারিখ- অজানা
মৃত্যু- ১ অক্টোবর, ১৯৭১
ঠিকানা: চরকমলাপুর, ফরিদপুর।

আকরাম আহমেদ
সেক্টর - কিলোফ্লাইট
পদক - বীর উত্তম
পদবী - ক্যাপ্টেন
গ্যাজেট নম্বর - ৭২
জন্ম তারিখ- অজানা
ঠিকানা: গাছঘাট , উপজেলা- দামুরহুদা, চুয়াডাঙ্গা।

শরফুদ্দীন আহমেদ
সেক্টর - কিলোফ্লাইট
পদক - বীর উত্তম
পদবী - ক্যাপ্টেন
গ্যাজেট নম্বর - ৭৩
জন্ম তারিখ- অজানা
মৃত্যু- ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
ঠিকানা: গ্রাম- সুলতানপুর, উপজেলা- কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

মাসরুর-উল-হক সিদ্দিকী
সেক্টর - ৮
পদক - বীর উত্তম
পদবী - ক্যাপ্টেন
গ্যাজেট নম্বর - ৭৪
জন্ম তারিখ -অজানা
ঠিকানা: গ্রাম- হবখালী , উপজেলা- সদর, নড়াইল ।

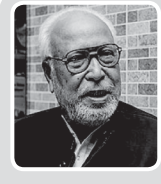

আবদুল কাদের সিদ্দিকী
সেক্টর - ১১
পদক - বীর উত্তম
পদবী - মুক্তিবাহিনী
গ্যাজেট নম্বর - ৭৫
জন্ম তারিখ - ১৯৪৭
ঠিকানা: গ্রাম- ছাতিহাটি, উপজেলা- কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

জামিল উদ্দিন আহমেদ
পদক - বীর উত্তম
পদবী - ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
জন্ম তারিখ - ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬
মৃত্যু - ১৫ আগস্ট ১৯৭৫

আগামী সংখ্যায় থাকছে:
বীর বিক্রম এবং
বীর প্রতীক

বঙ্গবন্ধু হত্যা: ১৬ আগস্ট জাতীয় পত্রিকার চিত্র

একটি পর্যালোচনা

দীয়া সিমান্ত
তথ্য সংগ্রহ: কামরুজ্জামান হিমু

বাংলাদেশ। ১৯৭৫। ১৫ই আগস্ট। ঢাকা। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর। গভীর রাত। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী। স্বাধীন বাংলাদেশের রুপকার। মহান স্বাধীনতার সূর্যসৈনিক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সোনার বাংলা গড়ার সোনালী স্বপ্ন বুকে নিয়েই চির ঘুমের দেশে চলে গেলেন। না! তিনি স্বইচ্ছায় সেদেশে যাননি। তার অনেক ভালবাসার স্বপ্নে ঘেরা শ্যামল ছায়া বেষ্টিত বাংলাদেশ। এদেশের বিপথগামী চক্রান্তকারীদের হাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। যেদেশের স্বাধীকার আদায়ে আজীবন জেল জুলুম সহ্য করে সংগ্রাম করেছেন সেদেশেই তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ দিতে হবে, এদেশের নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদ তা চিন্তাও করেননি। সেদিন তার সমস্ত চিন্তা উপেক্ষা করে দেশের প্রাণপ্রদীপ নিভিয়ে দেয়া হয় মূহুর্তে। থমকে যায় সোনার বাংলা। দেশ হয় নিস্তব্ধ। দিশেহারা। দিকহারা। নেতৃত্বহারা। সেদিন বিপথগামী সেনা সদস্যরা শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। মহান এই নেতার পুরো পরিবারকে নিস্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে তার নিকট আত্মীয়দের। নেতার অতি আদরের দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশের বাইরে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান। বঙ্গবন্ধু কন্যাদ্বয় প্রাণে বেচেঁ ছিলেন বলেই আজ মহান নেতার আদর্শে লালিত স্বপ্ন পুরনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

একটি জাতিকে যে নেতা স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। চাষা-ভুষা, স্বল্প শিক্ষিত জাতিকে নিজের পায়ে দাড়াঁতে শিখিয়েছেন। স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন।

নিজের ভাষায় কথা বলার সাহস যুগিয়েছেন। অধিকার আদায়ে দীপ্ত বলিয়ান হতে শিখিয়েছেন। সেই মহান নেতার মৃত্যুতে পুরো জাতির মতোই গণমাধ্যমও কী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল? বা গণমাধ্যম উপযোগী ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল? এমন চিত্র মেলে ১৫ই আগস্টের পরের দিনের পত্রিকাগুলো পাঠে।

যদিও সেসময় চারটি মাত্র জাতীয় পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতো।

ক্রম.	পত্রিকার নাম ও তারিখ	পৃষ্টা ও কলাম	সংবাদ শিরোনাম
১.	দৈনিক ইত্তেফাক ১৬ই আগষ্ট'৭৫	১ম পাতা ৬ কলাম	সাব হেড: দূর্নীতি স্বজনপ্রীতি উচ্ছেদ। সুবিচার ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষনা হেড: খন্দকার মোস্তাকের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর শাসনক্ষমতা গ্রহণ
২.	দৈনিক ইত্তেফাক ১৬ই আগষ্ট'৭৫	১ম পাতা ২ কলাম	উপরাষ্ট্রপতি, ১০ জন মন্ত্রী ও ৬জন প্রতিমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ
৩.	দৈনিক ইত্তেফাক ১৬ই আগষ্ট'৭৫	১ম পাতা	সম্পাদকীয় ঐতিহাসিক নবযাত্রা
৪.	দৈনিক ইত্তেফাক ১৬ই আগষ্ট'৭৫	শেষ পাতা ৬ কলাম	ছবি: নতুন সরকারের জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে দোয়া মাহফিল
৫.	দৈনিক বাংলা ১৬ই আগষ্ট'৭৫	১ম পাতা ৮ কলাম	সাব হেড: মুজিব নিহত: সামরিক আইন ও সান্ধ্য আইন জারি: সশস্ত্র বাহিনীসমূহের আনুগত্য প্রকাশ হেড: খন্দকার মুশতাক নয়া রাষ্ট্রপতি
৬.	দৈনিক বাংলা ১৬ই আগষ্ট'৭৫	৪ পাতা ১ কলাম	হেড: নয়া সরকারের জন্য বিশেষ মোনাজাত
৭.	দৈনিক বাংলা ১৬ই আগষ্ট'৭৫	শেষ পাতা ৫ কলাম	ছবি: শপথ গ্রহণ হেড: বিভিন্ন স্তরের জনসাধারনের অভিনন্দন
৮.	দ্য বাংলাদেশ টাইমস ১৬ আগষ্ট ১৯৭৫	১ম পাতা ৮ কলাম	সাব হেড: Martial law proclaimed in the country: Mujib killed হেড: Mushtaque assumes presidency
৯.	দ্য বাংলাদেশ অবজারভার ১৬ আগষ্ট ১৯৭৫	১ম পাতা ৭ কলাম	সাব হেড: Armed forces take over: Martial Law proclaimed: curfew imposed হেড: Mushtaque becomes President MUJIB KILLED: SITUATION REMAINS CLAIM

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট রাতে রাজধানী ঢাকায় এতবড় নৃশংস হত্যাকান্ডের পরের দিন দেশের প্রধান জাতীয় পত্রিকা গুলোর শিরোনাম দেখলে সহজেই দেশের ভীতিকর দিশেহারা অবস্থার পরিমাপ

OUR COMMENT
ON THE THRESHOLD OF A NEW ERA
সৌদী আরব ও সুদানের স্বীকৃতি
পূর্ণ মর্যাদায় সাবেক রাষ্ট্রপতির লাশ দাফন

অনুমেয়। ১৬ই আগস্টের ইত্তেফাক-এর শিরোনাম গুলো ছিল এরকম: দূর্নীতি স্বজনপ্রীতি উচ্ছেদ।। সুবিচার ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষনা, খন্দকার মোস্তাকের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর শাসনক্ষমতা গ্রহণ, উপরাষ্ট্রপতি, ১০ জন মন্ত্রী ও ৬জন প্রতিমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ এবং সম্পাদকীয়তে শিরোনাম ছিল "ঐতিহাসিক নবযাত্রা"। যেখানে সাধারণভাবে ১টি বড় হত্যাকান্ড ঘটলেই পরের দিন পত্রিকা গুলো গুরুত্বসহকারে সংবাদ পরিবেশন করে। সেখানে দেশের একজন রাষ্ট্রনায়ক ও দেশের স্বাধীনতার রুপকার মহান নেতা হত্যার শিকার হলেন সেই সংবাদটি জাতীয় পত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হলো না। আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি ও জানি সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা। ঘটনার বস্তুনিষ্ঠতা ও গুরুত্ব পরিমাপ করে সংবাদ ছাপানো সাংবাদিকতায় দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করে। দৈনিক ইত্তেফাকের মতোই দৈনিক বাংলা, দ্য বাংলাদেশ টাইমস, দ্য বাংলাদেশ অবজারভার প্রত্রিকা গুলো ১৬ আগষ্ট ১ম পাতাসহ অন্যান্য পাতায়ও ক্ষমতা দখলকারী খন্দকার মোস্তাক-এর উত্থান গুনগান গেয়ে সংবাদ পরিবেশন করে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু হত্যা বিষয়টি আসে অতিস্বল্প আকারে যা ছিল এ মাটিতে অবিশ্বাস্যরকম ঘটনা।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই। আছে তার আদর্শ। তার উজ্জীবনী প্রেরণা। তার সোনার বাংলা গড়ার আজীবন লালায়িত স্বপ্ন। তাই বঙ্গবন্ধু হোক আমাদের শক্তি। আমাদের স্বপ্ন পূরণের প্রেরণা। বঙ্গবন্ধু বেচেঁ থাকুক আমাদের দেশ গড়ার কাজের মাধ্যমে। আমাদের চেতনায়। আমাদের জাতিসত্বায়। আমরা বিরত থাকবো তাকে একদলের দিকে ঠেলে দিতে। বঙ্গবন্ধু হোক সমগ্র জাতির শ্রদ্ধার্ঘ।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ: ৭ই মার্চ ১৯৭১

১৬ কোটি মানুষের কথা বলবে, ৩৫০ জন জনপ্রতিনিধি
জানতে জানাতে ...

পার্লামেন্ট ফেইসের নিয়মিত আয়োজন

জন প্রতিনিধিদের কথা

আমরা আসছি
আপনার কাছে....
জানতে এবং জানাতে

চোখ রাখুন পাতা নাম্বর -৫৮

TechWorld BANGLADESH DECEMBER 2018 A Reader's Magazine www.techworldbd24.com

ACM-ICPC: World Finals 2018 And Bangladesh: A Way forward p-86

The Monthly

Price: BDT 60

TechWorld BANGLADESH

DECEMBER 2018 ■ www.techworldbd24.com

The Weirdest Uses of AI p-26

Digital Bangladesh Day and Realization of Nation's Dream p- 32

The End of Year Review and Planning Process Every Small Business p-68

Avoid Business Burnout: 10 real small business owners share their coping secrets P 25

P 52 Daraz Bank, Daraz sign E-Commerce Merchant financing deal

A Compilation of Command Prompt Tips, Tricks & Cool Things You can do P 40

P 84 To Make Change, We Need To Understand, The Industry's Diversity Paradox

Tops apps your startup needs right now P 23

SMB Malware: What are the threats and why are they getting worse? p-42

Amazon's new server chips cheaper than Intel's p- 15

If you want it we got it.
A firm for all your needs.
We print and supply anything you require.

For Quality Services

MOHAKAL

31, Nandalal Datta Lane, Laxmibazar, Dhaka. Bangladesh

Cell : 01720644040

Wedding is a magical day & we are here to Capture it all.

Services : All kinds of photography.
e.g. Model photography
Birthday, Parties, Ceremonies,
Product Photography etc.

George.

photography

31, Nandalal Datta Lane, Laxmibazar, Dhaka. Bangladesh

Cell : 01720644040

Intone Ultra
Higher Coverage
Excellent Scrub Resistance
Durable Finish
Highly Washable
www.rakpaintsbd.com
Careline: 09-678-111-222
/rakpaintsbd
RAK PAINTS
Intone Ultra
Higher Coverage
Excellent Scrub Resistance
Durabale Finish
Highly Washable

smartex Like

www.smartex-bd.com